অভ্রভেদী গিরিরাজ হিমালয়ে, পুণ্য অলকানন্দা, মন্দাকিনী ও জাহ্নবীর তীরে তীরে যে পথ গেছে তীর্থরাজ বদরিবিশালা ও কেদারনাথজীর চরণপ্রান্তে, সেপথে যাঁরা ছিলেন সহযাত্রী, যাঁরা ছিলেন সহায়,

তাঁদের উদ্দেশে—

গভীর গম্ভীর আহ্বান

কতো ভয়! এই বছরই তো একবার মে মাসে কুম্ভ স্পেশ্যালের টিকিট কিনেও ভিসার অভাবে ক্যান্সেল করতে হল যাত্রা, আবার যে যেতে পারবো তার কি ঠিক আছে কিছু? তীর্থ-দেবতা যদি প্রসন্ন না হন, যদি টেনে না নেন তাঁর কাছে তবে শত চেষ্টাতেও কি যাওয়া যায়?

এদিকে স্কুলে চলছে স্ট্রাইক, সামনে এম. এসসি. পরীক্ষা। কবে স্ট্রাইক হঠাৎ ভাঙবে এবং শুরু হবে পরীক্ষা, অথচ আমি থাকবো না—এই আছে এক চিন্তা; তার উপরে আবার নতুন যোগ দিয়েছি কলেজে, সেখানেই বা কি বলে ছুটি চাইবো। এক বারের বেশি যেতে দেয় না পাসপোর্টে; কেউ কেউ বলেছেন, বর্ডার থেকেই ফিরে আসতে হবে—এমনি শত চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন। কিন্তু ছুটি, ভিসা সবই পেলাম, বর্ডারও পার হলাম বিনা বাধায়। এলাম কলকাতায়। '৭১-এর গোলমালে খান-সেনারা তো সবই খান্ খান্ করে গিয়েছে। কিছুই নেই আমাদের, গরম জামা-চাদর, কাপড়—এক কথায় বরফাবৃত পাহাড়ে চড়ার মত সরঞ্জাম কিছুই নেই আমার।

এলাম কলকাতায়, ১৯৭৩-এর ছাব্বিশে আগস্ট। কুম্ভ স্পেশ্যাল ছাড়বে ছয়ই সেপ্টেম্বর। যাহোক করে মোটামুটি সবই যোগাড় করা গেল। আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই যেন ভয় বাড়তে লাগল। আমার যেরকম শারীরিক অবস্থা—মাথার কষ্ট, বুকের কষ্ট—পারবো কি সেই উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে উঠতে? দেবতাত্মা হিমালয়ের পুণ্য পবিত্র ধূলি স্পর্শ করব কোন্ সুকৃতির বলে?

কুম্ভ স্পেশ্যাল-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, ছয়ই সেপ্টেম্বরের রাত্রি নয়টায় সমস্ত যাত্রীদের সমবেত হ'তে হবে হাওড়া স্টেশনের নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে, বড় ঘড়ির নিচে। দেরাদুন এক্সপ্রেস ছাড়বে রাত্রি দশটা দশে; সেই ট্রেনেই জুড়ে দেওয়া হবে কুম্ভ স্পেশ্যালের কয়েকটি বগি।

ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের কাছ থেকেই বিদায় নিলাম, যদি আর ফিরে না আসি, হৃদযন্ত্র যদি বন্ধ হয়ে যায় হিমালয়ে! যাচ্ছি এতদিনের স্বপ্নে-দেখা হিমালয়ে, তবু চোখে জল ভরে আসে। সবাই অভয় দিলেন, জানালেন শুভ কামনা। ছেলের বাড়ির কাছেই আছেন এক বৃদ্ধা (লালটুর ঠাকুরমা); তিনি ঘুরে এসেছেন কেদারনাথ, বদরিনারায়ণ চার পাঁচ বছর আগে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদির কি কি লাগবে সবই তাঁর জানা—তাঁর নির্দেশমত প্রস্তুত হয়ে নিলাম। বদরিনাথজীর পূজার জন্যে এক এক টুকরো সোনা রূপোর পাত নেওয়ার কথাও তিনিই বলে দিলেন। দেহে কষ্ট, মনে ভয় আর বুকে আশা, আশঙ্কা, আনন্দের এক অজানা অনুভূতি নিয়ে প্রস্তুত হলাম। ট্যাক্সি এল, বউ, নাতনি, প্রতিবেশিনীরা সবাই এসে দাঁড়ালেন কাছে। অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিলাম। নিলাম সবার শুভেচ্ছা, 'জয়, বদরি-বিশালা কি জয়,—জয় বাবা কেদারনাথ' বলে উঠলাম গাড়িতে। হাওড়া স্টেশনে এসে দেখি একটা গেটে বড় সাইনবোর্ডে লেখা 'কুম্ভ স্পেশ্যাল,' সেই গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে, বড় ঘড়ির নিচে। কেউ এসেছেন, কেউ আসছেন—রাত্রি সাড়ে নয়টার মধ্যে দেখি একে একে সমবেত হয়েছেন অনেক লোক, মহিলার সংখ্যাই বেশি, পুরুষও আছেন কিছু। মহিলাদের মধ্যে বৃদ্ধা আছেন কয়েক জন—প্রৌঢ়া, তরুণী দুই-চার জন। আমার দৃষ্টি বৃদ্ধাদের দিকেই ঘুরে ফিরে যাচ্ছে, এঁরাও তো যাবেন, আমার তবে কেন এত ভয়! প্রায় দশটায় 'তুন এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। কুম্ভ স্পেশ্যালের ম্যানেজার ডেকে ডেকে সীট-নম্বর বলার পরে একে একে সবাই গাড়িতে উঠলাম। আমার লোয়ার বার্থ, সীট-নম্বর এগারো। আমার পাশের সীটে ফর্সা ধবধবে, কোমর-ভাঙা, থুথ্‌রে এক বুড়ীকে এনে বসিয়ে দিলেন, প্রায়-বৃদ্ধ তাঁরই ভাই। সঙ্গে আছেন ভাগিনী, বুড়ীর মেয়ে। পরিপাটি বিছানা পেতে বৃদ্ধাকে বসিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে দিচ্ছেন ভাই; নাতি, ভাগনে, আরও কতজন এসেছেন বিদায় দিতে। আমার ছেলে গেছে অফিসের কাজে বাইরে। আমার সঙ্গে কেউ নেই, নিজেই জিনিস গোছাচ্ছি, হোল্ড্‌অল খুলছি, বিছানা পাতছি। বৃদ্ধার ভাই ভাবলেন, আমি বুঝি খুব করিৎকর্মা; বললেন, 'বুড়ীটাকে একটু

দেখবেন।' হেসে উঠলাম, 'আমাকে দেখবে কে?' গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এল, কুণ্ডু স্পেশ্যালের কামরাগুলি ভর্তি, এখন একে একে বিদায় নেওয়ার পালা। আমার হাতের ঘড়ি দেখে বুড়ীর ভাই-এর খেয়াল হল, তাঁর ভাগিনী ঘড়ি আনে নি—তাড়াতাড়ি নিজের হাতের ঢাউস ঘড়িটা খুলে দিলেন ভাগিনীর হাতে। ভাগিনী বললেন, 'দরকার নেই মামা, ঘড়ি আমি ইচ্ছে করেই তো আনি নি।' মামা যত জোর করেন, ভাগিনী ততই মাথা নাড়েন। গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে, অগত্যা বুড়ীর হাতেই তাড়াতাড়ি ঘড়িটা পরিয়ে দিলেন ভাই। বুড়ীর ফোকলা মুখে সে কি সুন্দর হাসি! হাত ঘুরিয়ে বিদায়ী নাতি, ভাগনে, সবাইকে দেখাচ্ছেন; ঘড়ি পরার সুখে নয়, কৌতুকে, ছেলেমানুষির আনন্দে।

গাড়ি ছাড়লো—'জয়, দেবতাত্মা হিমালয়—জয় বদরি-বিশালা কি জয়—কেদারনাথজী কি জয়' ধ্বনির মধ্যে।

গাড়িতেই শুনলাম, কেদারনাথের রাস্তা খারাপ, ধ্বস নেমেছে; ভাগ্য ভাল থাকলে যাওয়া হবে—এখনও বলা চলে না যাওয়া যাবে কি না। প্রোগ্রাম বদলে গেল, আগেই বদরিনারায়ণ যাত্রা। 'জয় বদরিনাথ'। যে ইচ্ছা দীর্ঘদিন যাবৎ মনের মধ্যে লালন করে এসেছি, প্রথম বদরিনারায়ণ দর্শন করব যদি ভাগ্যে ঘটে, তারপরে কেদার। জানি কেদারের রাস্তা বেশি দুর্গম, যদি সে পথে মৃত্যু ঘটে তবে আর তো বদরিনাথের দর্শন পাব না।

আজ তাই প্রথমেই বদরিনাথে যাত্রা করা হচ্ছে শুনে মন আনন্দে ভরে উঠল।

আমাদের কামরায় আছি আমরা ১৩।১৪ জন। রামকৃষ্ণ মিশন সারদা-মাতৃসদন থেকে এসেছেন এক সেবিকা, ডান পা-টা তাঁর প্রায়-পঙ্গু। আলাপ হল, ইনিও মহারাজের (শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দজী) শিষ্যা, মুহূর্তেই এক সূত্রে যেন গাঁথা হয়ে গেল মন-প্রাণ! কামরা ভর্তি করে উঠেছেন একটি দল—ভাগিনী, মামী, মামীর মামী, বোন, কাকী, আট-নয় জন। ডাকাডাকি, হাসাহাসি—পরিপূর্ণ আনন্দের একটি ধারা বয়ে চলেছে নিজেদের মধ্যে। কারও নাম নীলু, কেউ বুলু, কেউ মামীদি, কেউ মধু, কেউ টুণ্টু! কুণ্ডু স্পেশালের টুণ্টু? ওরে

বাবা! এমন নাম তো আর শুনি নি—কাশীর ঢুণ্ডিরাম গণেশের কথা মনে পড়ে যে, দেখছি বপুখানিও অনেকটা তাঁরই মত।

তারপরের কামরায় অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন একজন, আর পাঁচ-ছয় জন ভদ্রলোক। মালদা-র এক পার্টি, বাঁকুড়ার এক পার্টি, আর এক পার্টি বর্ধমানের। মোট কথা, প্রত্যেক পার্টিই স্ফীতকলেবর—সবাই 'বর্ধমান', 'ক্ষীয়মান' কেবল আমরা তিনজন, কিরণ মুখার্জী, আমি আর এক বুড়ী, আমরা মাত্র তিনজনের 'একক'। তারও মধ্যে আমি আরও একা, অপাংক্তেয়। আমার জামাকাপড়, অর্থ, সামর্থ্য কিছুতেই কোনও কৌলীন্য নেই। তার উপর আমিই একমাত্র পূর্ববঙ্গের 'বাঙাল'। কাজেই আমি চলেছি একা, কারও অন্তরের ছোঁওয়া পেয়ে ধন্য হব সে আশা বোধ হয় নেই। যদি আমার দেশের লোক থাকত দুদিনেই মাসী, পিসী, দিদি পাতিয়ে বসা যেত—এখানে সেটা বাড়াবাড়ি হবে বলেই মনে হচ্ছে। রাত হয়েছে—সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়া গেল। গাড়ি চলছে, নীরব নিবিড় রাত্রি, কত নাম-না-জানা স্টেশন পেরিয়ে চলেছি হরিদ্বারের পথে। হরিদ্বার অথবা হরদোয়ার। সেই দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করতে পারব কি পুণ্য হিমালয়ের ক্রোড়ে? কে জানে?

৭ সেপ্টেম্বর, '৭৩

ভোর পাঁচটায় ঘুমটা গভীর হয়ে উঠেছে, কে ডাকে রে বাবা, দিলে তো আরামের ঘুমটা ভাঙিয়ে! তাকিয়ে দেখি 'বেড টি' হাজির। তৎপর হয়ে উঠেছে কুণ্ডু স্পেশ্যালের পরিচারকেরা। ঘুমচোখে শীতের আমেজে চা পেয়ে মনটা অবশ্য চাঙা হয়েই উঠল। ভাবলাম এই ই বুঝি সকালের খাওয়া। কিন্তু আমার তো চা আরও দু এক বার খেতেই হবে—স্টেশনের যখন অভাব নেই, পয়সাও কিছু আছে, চা পাবার অসুবিধা হবে না কিছু!

গাড়ি তৎক্ষণে কলমুখর হয়ে উঠেছে—কেউ স্তোত্র পাঠ করছেন, কেউ করছেন গান, কেউ টুথব্রাশ আর তোয়ালে নিয়ে চলেছেন বাথরুমে। আমি বসে আছি জানালার ধারে, নতুন নতুন দৃশ্য দেখছি দুই চোখ মেলে। ধীরে

ধীরে স্নান-টান শেষ করলাম, এবারে চা আর খাবার কিনতে হবে। জমা-খাটি ঘিয়ের গন্ধে নাসিকাগহ্বর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যে; দেখি, খাবার তৈরি হচ্ছে গাড়িতেই। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই বড় বড় কয়েকটা সিঙ্গাড়া আর কাপভর্তি ধূমায়িত চা নিয়ে হাজির কুণ্ডু স্পেশ্যালের লোক। সঙ্গে অল্প-বয়সী হাসিখুশি ম্যানেজার শ্রীঅমর সরকার। ভদ্রলোক রসিক, সদালাপী, মিষ্টভাষী। আলাপ হল তাঁর সঙ্গে, বাড়তি টাকা-পয়সা জমা রাখলাম তাঁর কাছে।

সকাল সাতটা পাঁচে গাড়ি গয়া স্টেশনে এসে থামল।

প্রণাম তোমায় বিষ্ণুপদ-চিহ্নিত পুণ্যতীর্থ! প্রণাম বিজয়কৃষ্ণ তোমাকে, আর আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তোমার দীক্ষাদাতা গুরুকে! তিনবার এসেছি তোমার কোলে—স্বামীর সঙ্গে এসেছিলাম শ্বশুরের পিণ্ডদান করতে। তার কয়েক বছর পরেই ছেলেকে নিয়ে এসেছিলাম স্বামীর পারলৌকিক কাজ করতে। আরও একবার এসেছিলাম মাকে নিয়ে। গয়া শুধু প্রেতাত্মার মুক্তিতীর্থই নয়, গয়া সর্বমানবের মহাতীর্থ। বিষ্ণুপদ-চিহ্নে একদিন যিনি স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন সেই মহাপ্রভুর দেব-লাঞ্ছিত চরণের ধুলায় গয়ার প্রতিটি ধূলিকণা পুণ্য, পবিত্র। মনে পড়ে, "যে দিন বিষ্ণুপদ-চিহ্নে মাথা ঠেকাইলেন ভক্তরূপী স্বয়ং ভগবান, আরম্ভ হইল মহাপ্রকাশ, স্বেদ বাষ্পপুলকে অঙ্গ ভরিয়া উঠিল, নয়ন হইতে অজস্র ধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া বিষ্ণুপদতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য প্রভুপাদ ঈশ্বর পুরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নিমাইয়ের আর্তি দেখিয়া মনে পড়িল বিরহিণী রাধিকার বিরহ-ব্যথার দহনে-দগ্ধ গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তিমের আর্তনাদ—'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে, অয়ি মথুরানাথ। আমার হৃদয় তোমার বিরহে বিদীর্ণ হইতেছে ওগো বল, কি করিব আমি?'

ঈশ্বর পুরী নিমেষবিহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন নিমাইয়ের দিকে। অশ্রু-ভারাক্রান্ত পদ্মনয়ন দুইটি ঊর্ধ্বে মেলিয়া নিমাইও দেখিলেন শ্রীপাদ পুরীকে। নিমাই তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন, 'আমাকে আপনি কৃপা করিয়া দীক্ষা দান করুন, আমি এই দেহ-মন আপনার পদতলে সমর্পণ করিলাম।'

শুভদিনে নিমাই দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর পুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন—'আশীর্বাদ করুন আমি যেন কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ভাসি।' অশ্রুজলের ধারার মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন ঈশ্বর পুরী, হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইলেন গৌর-কিশোর মূর্তিখানি।"*

গয়া স্টেশনে গাড়ির মধ্যে বসেই প্রণাম জানালাম সেই তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ গৌর-হবির চরণে, প্রণাম জানালাম ঈশ্বর-গুরু ঈশ্বর পুরীর পায়ে।

গাড়ি চলল—কী সব সুন্দর নাম স্টেশনগুলির! কত ঐতিহাসিক স্মৃতি বুকে নিয়ে দেখা দিল সাসারাম, মীর্জাপুর, আর কত বিখ্যাত স্টেশন। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি বারাণসী, অযোধ্যা, শিবভূমি, আরও রামরাজ্য। এবার এসব পুণ্যভূমিতে নামা হল না, তাই পূর্ব-স্মৃতিব মালা গেঁথে চলেছি মনে মনে।

দুপুর বারোটাব মধ্যে সকলের স্নান সাবা। সীটে সীটে থালা আর জলের গ্লাস রেখে গেল কুণ্ডুব লোকেরা, মেসিনের মত চলছে তাদেব হাত। সুধীর, হরি, বলাই প্রভৃতি সাত-আট জনে কামরায় কামরায় পবিবেশন করে চলেছে, সাদা ফুলের মত বাসমতী চালের ভাত, ডাল, ভাজা, তরকারি। স্বাদে গন্ধে কোনটাই ফেলনা নয়—ক্ষুধার মুখে অমৃতের মতই লাগল। শেষ পাতে একটু করে দই-এরও ব্যবস্থা। পরিপূর্ণ আহার! তীর্থযাত্রায় আমিষ বর্জিত, সবই নিরামিষ—খাঁটি তেল আর লক্ষ্মী ঘি-এব রান্না।

এমন তৃপ্তিকর খাওযার শেষে শোবার আরাম ছাড়া আর কি-ই বা করণীয় থাকে? শুয়ে পড়া গেল। বিকেল থেকেই একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল, সন্ধ্যায় লক্ষ্ণৌ স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই ঝম্-ঝম্ করে নামল বৃষ্টি, প্ল্যাটফর্মে জমল প্রায় এক-হাঁটু জল। টুণ্টুদিদের আত্মীয়ারা এসেছেন দেখা করতে—ভিজতে ভিজতেই কথা বলতে হল তাঁদের সঙ্গে। পনেরো মিনিট পর গাড়ি ছাড়ল, শুভেচ্ছা জানিয়ে ও বদরি-বিশালাজীর জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

মন ভেঙে গেল, বৃষ্টির তো থামবার কোনও লক্ষণই দেখছি না। এরকম চলতে থাকলে কি হবে পাহাড়ের পথের অবস্থা! শুনেছি বৃষ্টি হলেই পাহাড়ে

*লেখিকার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ('জিজ্ঞাসা', ১৩৭২) দ্রষ্টব্য।

ধ্বস নামে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। কেদারের রাস্তা তো খারাপ হয়ে গেছেই— বদরিনাথের রাস্তাও কি বন্ধ হয়ে যাবে? জানি না নারায়ণ! তোমার কি ইচ্ছা—পথে বের করেছ কি ব্যর্থমনোরথ করে ফিরিয়ে নেবার জন্যে?

বিকেলে চায়ের সঙ্গে জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল, রাত্রি নয়টা না বাজতেই আবার সীটে সীটে দিয়ে গেল থালা—ক্ষুধা বিশেষ ছিল না, তবুও খেলাম সামান্য ভাত। রাত্রে লুচি, রুটি, ভাত তিনটেই আয়োজিত—যার যা রুচি! দেখা গেল রুটির চাহিদাই বেশি, আমার মত দুই-একজন ভেতো বাঙাল ছাড়া সবাই রুটির পক্ষপাতী। লুচি সবার জন্য—ভাত বা রুটির সঙ্গে যে যতটা নেয়। খাওয়া দাওয়ার ভারি চমৎকার ব্যবস্থা—৫৯৫ ০০ টাকার টিকিটের মধ্যেই সব।

কিছুক্ষণ বসে রইলাম জানালার কাছে, জানালা খোলবার উপায় নেই, বৃষ্টি চলছে অবিরাম। করবার কি আছে আর? ঠাকুরের কাছে বৃষ্টি থামাবার প্রার্থনা জানিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কাল ভোরেই পৌঁছব হরিদ্বার।

৮ সেপ্টেম্বর, '৭৩

পুণ্য প্রভাতে হরিদ্বার স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। প্রায় সবাই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম প্ল্যাটফর্মে—চোখে পড়ল দিগন্তবিস্তৃত শ্যাম বনরেখা আর আকাশ ছোঁওয়া পর্বতশীর্ষ, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

হরিদ্বারের বাতাসই স্নিগ্ধ পুণ্যময়। সকালবেলার চা খাওয়ার পরেই সবাই রওনা হলাম গঙ্গা আর ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশ্যে, সঙ্গে গেল সুধীর। হরিদ্বার আজকাল পুরা শহর—সিনেমা, স্কুল কলেজ, মনোহারী দোকান, বাজার, কি নেই?

টাঙ্গায় চলেছি আর দেখতে দেখতে যাচ্ছি শহর, রিক্সা, ট্যাক্সি সবই আছে হরিদ্বারে। ভোলা গিরি মহারাজের ধর্মশালা ডাইনে রেখে, মোতি বাজার পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে। লোকে লোকারণ্য—নানাদেশি লোক, মহিলার সংখ্যাই বেশি। কেউ স্নান করে উঠছেন, কেউ গঙ্গায় আবক্ষ দাঁড়িয়ে স্তোত্র পাঠ করছেন, কেউ কাপড় চোপড় রেখে গঙ্গায় নামবার

উপক্রম করছেন। পাড়ে বসে আমি আমার জামায় একটু সাবান ঘষছি—এর মধ্যেই তেড়ে এল এক দশাসই জোয়ান পুরুষ! তার ধমকের চোটে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া! সাবান মাখা যে এখানে নিষেধ সে কথাটা একটু মোলায়েম করে বললেই তো হয়, বাপু। তা নয়, সে এই মারে তো সেই মারে! যত বলি, 'বাবা, আমি জানতাম না, এই যে সরিয়ে নিচ্ছি সাবান', ততই সে গর্জন করে ওঠে হিন্দী ভাষায়—'এক্ষুনি সরাও, নয় তো আমি ছুড়ে ফেলে দেব সাবান।' পড়ি কি মরি ছুটে গিয়ে অনেকটাই দূরে আপদ সাবানটা সিঁড়ির উপরে রাখলাম। দেখি, তাতেও নিস্তার নেই। 'নেহি নেহি উঠাও জলদি, না তো হাম ইয়ে ফেক্ দুঙ্গা'—চোখ লাল করে ছুটে এগিয়ে এল সেই বীরপুরুষ। মারবে নাকি রে বাবা! তাড়াতাড়ি সাবান নিয়ে আরও দূরে সরে যাই। সাবান খোলা রাখাও চলবে না—কোনও মতে ঢাকাঢুকি দিয়ে তবে নিস্তার পাই।

মনটা মুষড়ে গেল—তীর্থযাত্রার প্রথম পদক্ষেপেই এই ধমক। এ কি অশুভের সূচনা?

হর পুণ্য সলিল মাথায় স্পর্শ করে ঘাটে নামলাম, কয়েকটি ডুবও দিলাম। আ, কি স্নিগ্ধ শীতল সে গঙ্গা বারি! মা যেন দুহাত বাড়িয়ে তাঁর কোমল বক্ষে টেনে নিলেন বিব্রত সন্তানকে। দেহ মন জুড়িয়ে গেল। বিষ্ণু-চরণোদ্ভবা গঙ্গার পুণ্য ধারায় অবগাহন করে শান্ত সমাহিত চিত্তে তীরে উঠে এলাম।

আমার সহযাত্রীরা সকলে একে একে স্নান-শেষে সমবেত হলেন, চললাম সপ্তর্ষির আশ্রম, ভীমগোড়া, শ্রীগুরু-আশ্রম আর পরমার্থ আশ্রমের উদ্দেশ্যে—কিছুটা পথ টাঙ্গায়—কিছু পায়ে হেঁটে।

আমার পাশের সীটের সেই কোমর ভাঙা থুত্থুরে বুড়োও সমান তালে চলেছেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, টাঙ্গা, পায়দল—সবদিকেই বাজিমাত করে চলেছেন তিনি। শুধু হাঁটার সময় শিরদাড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে একটু করে দাঁড়াতে হয়।

দর্শন শেষে বেলা দুটোয় শ্রান্ত দেহে ফিরে এলাম, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। আমাদের বগিগুলো কেটে রাখা হয়েছে একধারে, কিন্তু তাতে জল, আলো বা পাখার কোনও অসুবিধা হয় নি—বিশেষ বন্দোবস্ত আছে কুম্ভ স্পেশ্যালে।

দুপুরে যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম করা গেল। বিকেলে আবার বেরিয়ে পড়লাম সবাই, আমাদের লক্ষ্য ব্রহ্মকুণ্ডে। কয়েক বছর আগে যেবার হারদ্বারে এসেছিলাম সেবার ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে জল ছিল না। সামনে ছিল কুম্ভমেলা, তাই জল সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেতুর প্রয়োজনে। তাই সেবারে বহুশ্রুত গঙ্গাজীর সান্ধ্য দীপারতি দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নি। কিন্তু দেখেছিলাম নীল ধারা—গঙ্গার আর একটি অপূর্ব সুনীল ধারা যেন কাচ-স্বচ্ছ একটি বেগবতী প্রবাহিণী। এবারে তাই সন্ধ্যার আগে আগেই এসে বসলাম ঘাটে। সকালে দেখেছিলাম একটি বামনাকৃতি গেরুয়া-বসনা নারী বসে আছেন ঘাটে, দুই চারটি ফুল আর একটি ঝাঁপি নিয়ে। অনেকেই তাঁকে প্রণাম করে পয়সা দিয়ে যাচ্ছেন। আমিও দিয়েছিলাম কিছু, দেখলাম মন্দ জমে নি পয়সা সিকি-আধুলি টাকা। এখন সন্ধ্যাবেলায়ও এসে দেখছি, জনে জনে পয়সা চেয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি, সেই গৈরিকধারিণী। আমার যেন কি হল—হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত পয়সা নিয়ে কি কর মাঈজী?' আমার কথা মুখ থেকে বেরোল কি বেরোল না - মাইজী তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে গর্জে উঠলেন, 'কেয়া? পয়সা দিয়ে কি করি? তারপর অনর্গল রুক্ষ তীক্ষ্ণ স্বরে হিন্দীতে তিনি কি যে বললেন তা সব বুঝলাম না। তিনি হঠাৎ আমার সামনেই ঝনাৎ করে সেই পয়সার ঝাঁপিটি ফেলে দিয়ে রাগে গর গর করতে করতে বললেন,—তিনি ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি পয়সা নিয়ে কি করেন, এতবড় কথা জিজ্ঞেস করবার স্পর্ধা আমি পেলাম কোত্থেকে? ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল, তাড়াতাড়ি ক্ষমা চেয়ে কিছু বেশি পয়সা নিয়ে তাঁকে সাধতে লাগলাম। কিন্তু কার কথা কে শোনে? কিছুক্ষণ বাদে ছড়ানো পয়সাগুলি নিজেই আবার তুললেন, আর আমার পয়সা তো নিলেনই না, গর্জন করতে করতে চলে গেলেন উপরে। এক সৌম্যশান্ত বৃদ্ধ তাঁকে অনেক বোঝালেন, 'লাও মাঈজী, পয়সা লাও, এ না জেনে বলে ফেলেছে একটা কথা—রাগ কর না—ওকে মাপ করে দাও।' কা কস্য পরিবেদনা। গট্‌গট্‌ করে তিনি চলে গেলেন। ভয়ে, লজ্জায়, সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলাম আমি।

অশান্ত মন নিয়ে চোখ ফেরালাম গঙ্গার দিকে। গঙ্গার বুকে শত শত

প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছেন পুণ্যার্থী নর-নারীর দল, মুখরিত হচ্ছে চারদিক গঙ্গামাঈর জয়ধ্বনিতে, গঙ্গার বুকে নেচে নেচে চলেছে পুষ্পসজ্জিত দীপাধার। ওদিকে গঙ্গাজীর মন্দিরে স্থরু হয়েছে আরতি। জাহ্নবী বক্ষে শত শত জ্যোতির্মালায় আকাশের তিমিরাবরণ অপসারিত হচ্ছে—কী স্থন্দব, অনির্বচনীয় দৃশ্য! কিন্তু আমার মন তো শান্তি পাচ্ছে না—কেন আমি এক সন্ন্যাসিনীর মনে আঘাত দিলাম? আমি চলেছি অজানা দুর্গম তীর্থে—কার কি অভিশাপ বহন করে চলেছি কে জানে?

উঠে এলাম উপরে, দেখি সেখানে বসে আছেন সেই মাঈজী। ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরলাম। হিন্দী বলতে পাবি না তবুও বললাম, 'মাপ কর মাঈ। হামারা বহুৎ কস্থর হো গিয়া, মাপ কর আমাকে। আমি চলেছি বদরিনাথ দর্শনেব আশায়, তুমি ক্ষুন্ন হলে যে আমার তীর্থযাত্রা ব্যর্থ হয়ে যাবে, মাঈ।' প্রথমে একেবারেই আমল দিতে চাইলেন না। 'চলে যাও, সরে যাও, কোনও কথা শুনতে চাই না তোমার' গর্জন করে উঠলেন। আবার পায়ে হাত দিলাম, আবাব মার্জনা চাইলাম, আধুলিটি হাতে নিয়ে আবাব মিনতি করলাম। এবারে স্বর একটু যেন নরম হল। নিলেন আধুলি, বললেন, 'আউর কভি এ্যায়সা বাৎ মৎ বোলো।' আবারও? নাকে খৎ দিয়ে, বদরি বিশালার দোহাই দিয়ে আশীর্বাদ চাইলাম, বললাম 'আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কব মা যেন আমার তীর্থযাত্রা সফল হয়।' এবাব করুণাধাবা নেমে এল, মিলল এসে ভাগীরথীব পুণ্যধারায়, আর সেই সঙ্গমে এতক্ষণে হল আমার তীর্থস্নান।

সন্ধ্যার পরে স্টেশনে ফিরে এলাম—মানুষে মানুষে গম্ গম্ করছে চারদিক। সকাল থেকেই দেখছি নানা যাত্রীর আসা যাওয়া। আমাদের গাড়ির মতই সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে আছে ব্যানার্জী স্পেশ্যাল—বোম্বে-মাদ্রাজ-গুজরাটেব আরও কত ছোট ছোট গাড়ি গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর যাত্রী নিয়ে এসেছে কুণ্ডু স্পেশ্যালেরই আর একটি গাড়ি। গাড়ির যাত্রী ছাড়াও পায়ে-হাঁটা যাত্রীও আছেন অনেক—এক একটা বড দলে আছেন পাঞ্জাবী মাদ্রাজী-গুজরাটী, দেহাতি, সাধারণ মানুষ কৃষক, কত দীন-দরিদ্র মানুষ। কেউ বদরি-

বিশাল দর্শন করে পায়ে হেঁটে ফিরে এসেছেন—কেউ বা প্রস্তুত হচ্ছেন সেই দুর্গম পথে যাত্রার জন্যে। এ যেন এক মহামেলা বসে গেছে হরিদ্বার স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে চলেছে রান্না—রুটি সেঁকা। দিনান্তে একবার মাত্র সেই আহার্য গ্রহণ করবেন এঁরা। অনেকে রান্না-শেষে আহার করে খোলা আকাশের নিচেই পেতেছেন কম্বল-শয্যা। এক-একটা স্ত্রীপুরুষেব বিরাট দল খঞ্জনি আর ঢোল বাজিয়ে করছেন রামনাম, কৃষ্ণনাম। চোখে তাঁদের সুদূরের পিপাসা, আর এক পুণ্যতীর্থ-যাত্রার দুরধিগম্যতার আতঙ্ক, কিন্তু মন ভরে আছে ভক্তিতে আর অচঞ্চল বিশ্বাসে। ওঁদের কাছে যাই, জিজ্ঞাসা করি—'কোথায় চলেছো মাঈ—কোথা থেকে এসেছো—কেমন করে যাবে?' বলেন, 'এসেছি অনেক দূর থেকে, যাব কেদারজীর দর্শনে, যাব বদরি-বিশালের চরণতলে, ঠাকুর যদি টেনে নেন, যাব পায়ে হেঁটে।' বাস এর যাত্রীও আছেন অনেক। এক-এক গাছের তলায় আসন বিছিয়েছেন কিছু কিছু সাধু-সন্ন্যাসী।

কোনও কোনও দলের মধ্যে সন্ন্যাসিনীও দেখতে পাচ্ছি, হাতে হাতে ফিরছে লম্বা কলকে, পরম সুখে টেনে চলেছেন এক-একজন নিমীলিত নেত্রে। কেউ কেউ বা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছেন—হাসি-গল্পও চলছে বেশ। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবেন তাঁরা। মনে হল, কথা বলতে ইচ্ছে নেই তাঁদের, যেন বিরক্ত—তাই সরে এলাম ধীরে ধীরে।

হঠাৎ একটু দূর থেকে কানে এল সুমধুর গানের সুর, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন কেউ। এগিয়ে গেলাম। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর গাড়ির সামনে বসা কয়েকজন, গান গাইছেন একজন পুরুষ। খুব ভাল লাগল, বসে পড়লাম মাটির উপরেই। পাশে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা। গান শেষ হলে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। কথায় 'ঢাকাইয়া' টান শুনে কানে যেন মধুবর্ষণ হল। পেলাম যেন অন্তরঙ্গ মানুষের দেখা। দীর্ঘকাল আগে দেশ ছেড়ে এসেছেন; কিন্তু ভাষা ছাড়তে পারেন নি। আমাকে সহজে ছাড়লেন না। ওঁদের যাত্রীসংখ্যাও বোধ করি আমাদের মতই প্রায় সত্তর জন—কিন্তু আমারই মত তিনিও বাঙাল এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আধ ঘণ্টার মধ্যে

তাই দুজনেই দুজনকে প্রাণভরে 'দিদি, দিদি' ডেকে নিলাম। কাল ভোরেই তো চলে যাব যে যার পথে। রাত্রি নয়টা বাজে, বিদায় নিয়ে গাড়ির কামরায় নিজের সীটে এসে বসলাম, রাত্রির খাওয়া দেবে এখনই।

আজ আর বৃষ্টি নেই—সারা দিনটাই ছিল সুনীল আকাশের উজ্জ্বলতায় আলোয় আলোময়। কাল ভোরে হৃষিকেশ যাত্রা, মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ—এই কামরাগুলোই আবার বোধ করি 'দুন এক্সপ্রেসে'ই লাগিয়ে দেওয়া হবে। জানালার কাছে বসে আছি নিদ্রাবিহীন চোখে, আর সবাই শুয়ে পড়েছেন। সুধীররা এসে টপাটপ সব জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে, খুব চোরের ভয়। আমার আবার এত দমবন্ধ ঘরে ঘুম আসে না, চুপ করে শুতেও পারছি না—ছটফট করছি। রাত্রি বাড়ছে, স্টেশনের কল-কোলাহল স্তব্ধ, কি করি! সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আস্তে আস্তে জানালাটা খুলে দিলাম। আঃ! কি শান্তি—কি স্নিগ্ধ বাতাস! ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল, কিন্তু মাঝরাতে কিসের অস্বস্তিতে জেগে উঠে দেখি কখন কে এসে আবার জানালা বন্ধ করে গেছে। ঘুম আর হল না-রাত্রি কাটল এপাশ-ওপাশ করে।

৯ সেপ্টেম্বর '৭৩

ভোর না হতেই অন্য গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হল আমাদের বগি। এলাম হৃষীকেশ। চারদিকে পাহাড় ঘেরা, শান্ত শহর। চায়ের পরে অনেকেই চলে গেলেন লছমনঝোলা, কেউ বা ট্যাক্সি করে মুসৌরী। আমার শরীরটাও ভাল লাগছে না—যেখানে যাবার মানসে এসেছি সেখানেই যেতে চাই আগে। অর্থ আর শ্রম, কোনওটাই আগে খরচ করে দেউলে হতে আমি রাজি নই। তাছাড়া একবার দেখে গেছি লছমনঝোলা—হেঁটে তিন মাইল পার হয়ে গেছি, গীতাভবনে। হিমালয়ের পদপ্রান্তে মাথা ঠেকিয়েছি, আর প্রার্থনা করেছি বদরীনাথের কৃপা। আজ যদি সেই কৃপা লাভ করতে হয়, তবে বসে বসে প্রতীক্ষাই করব, যাব না আর কোথাও। আগামীকাল ভোরে আমাদের যাত্রা শুরু হবে, ভাবছি সমুখের বন্ধুর পথ উত্তীর্ণ হতে পারব কিনা। শরীর

কখন না জানি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে, মাথাটা কখন বাদ সাধবে—সে নোটিশ তো আমি আগে থাকতে পাই নি। কেন এলাম, কোন্ দুঃসাহসের পাখায় ভর করে আমি চলেছি অজানার পথে—আত্মীয়-পরিজন আর ছোট্ট ঘরের মায়া যে আজ আমাকে কেবলই পেছনে টানছে। নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে কেন পা বাড়ালাম? গাড়ীর মধ্যে একা বসে আছি; দুশ্চিন্তায় ভরে আসছে মন। কিন্তু কি যাদু ছিল সেই শান্ত পরিবেশের মধ্যে, কি যাদু ছিল হৃষীকেশের আকাশে-বাতাসে, কি অভয়বাণী ছিল হিমালয়ের ডাকে? মন ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল—'আমি আর ভয় করব না, প্রভু। আমার শুধু একটিই প্রার্থনা, আমাকে তুমি দর্শন দিও, পথেই যেন আমার মরণ না আসে, তোমার দুয়ারে একবার মাথা ঠেকাতে দিও—আমার সারা জীবনের স্বপ্নকে সার্থক কর তুমি!'

চলতি গাড়ির দোলায় আমার ঘুম আসে,—আরামের ঘুম। কিন্তু থেমে-থাকা গাড়িতে আমার কাছ থেকে ঘুম যেন পালিয়ে যায়। কাল সারারাত ছিলাম হরিদ্বার স্টেশনে—অচল ট্রেনে, তাতে আবার দরজা-জানালা বন্ধ। প্রায় সারা রাতই ঘুম আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। আজও ঘুম হবে না, আর ঘুম না হলে মাথা ঘুরবেই—এ তো আমার জানা।

হৃষীকেশের গৈরিক আকাশে একসময় নেমে এল নীরব সন্ধ্যা—তারপর স্তব্ধ রাত্রি। গাড়ির মধ্যে চলছে গুঞ্জন, হাসি-ঠাট্টা—নারী-পুরুষ সবাই বসে গেছেন এক সঙ্গে, আড্ডা জমেছে পুরোদমে। শুধু আমার পাশের অমিয়াদি, আর কিরণদি সভক্তি স্তোত্র-পাঠ করে চলেছেন ধীরে, মৃদুস্বরে।

ম্যানেজার এসে বললেন, বাড়তি জিনিসপত্র এখানে তাঁদের হেপাজতে রেখে যেতে পারা যাবে—যাঁর যাঁর ইচ্ছা রেখে যেতে পারেন, সঙ্গেও নেওয়া যাবে, কিন্তু কেদারনাথের পথে মালের ভাড়া লাগবে প্রতি কে. জি. দেড় টাকা করে। ওখানে মালবহনকারী নিতেই হবে এবং তার ভাড়া নিজেদেরই বহন করতে হবে—কুণ্ডু স্পেশ্যালের সেটাই নিয়ম।

সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেললেন, প্রত্যেকের জিনিসের সঙ্গে নিজ নিজ নামের লেবেল সেঁটে দেওয়া হল; ম্যানেজার জিনিসগুলি বুঝে নিলেন। ব্যাস,

এবার ওঁদেরই দায়িত্ব—আমরা দায়মুক্ত ; ফিরে এসে যার যার জিনিস ওঁদের কাছ থেকে বুঝে নেওয়া যাবে।

রাত্রি নয়টায় যথারীতি খাবার এল। খাওয়ার পর আর কি ? একে একে শয্যাশায়ী হলেন সবাই। স্তব্ধ পাহাড়-ঘেরা নিশীথিনীর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ, তারপরে আমিও শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম ? না, আজও নিদ্রাদেবীর কৃপা হল না আমার উপর। তন্দ্রায়-জাগরণে রাত্রি কাটতে লাগল—ভোরের প্রতীক্ষায় কাতর হয়ে উঠল দেহমন।

১০ সেপ্টেম্বর, '৭৩

সমস্ত প্রতীক্ষার অবসানে আজ এখনই আমাদের যাত্রা শুরু হবে বদরি-বিশালাব পথে। তীর্থদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে উঠে বসলাম। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে হবে—বাস তৈবি, রওনা হতে হবে সাতটার মধ্যে। 'বেড টি' পান করে, বিছানাপত্র বাঁধাছাদা করতে করতেই বাস এসে গেল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে তৈরি হলাম সবাই। দু'রাত্রি ঘুম ছিল না, শরীর অত্যন্ত খারাপ, মাথা দেখি এখনই ঘুরছে, ভয়ে কাঁপছে বুক, কি হবে কে জানে ? পারব কি তীর্থ-দেবতার চরণে পৌছাতে ? সফল হবে কি আমার সারা জীবনের কামনা ? বহু রাত্রির স্বপ্নে-দেখা হিমালয়ে সত্যই কি আমি উত্তরণ কবতে পারব ?

আমাদের দলের জন্যে দুইটি বাস ঠিক করা হয়েছে। বাস-টিকিটের মূল্যও আমাদের ঐ ৫৯৫ ০০ টাকার মধ্যেই। আমাদের শুধু ওঠা আর বসা—ব্যবস্থা'দি সবই কুণ্ডু স্পেশ্যালের।

বাস প্রস্তুত। একে একে সবাই এসে উঠলাম। যাঁর যাঁর পছন্দমত সীট আগেভাগে দখল করে নিলেন সবাই। আমি দলছাড়া, সুতরাং জানালার ধারে বসবার সাধ, আর সাধ্য, দুই-ই বিসর্জন দিয়ে আমাকে বসতে হল মাঝের সারিতে। একেবারে সমুখের সীটও আগেই রিজার্ভ করা হয়ে গেছে—জনপ্রতি বাড়তি ২০ ০০ টাকা দিলে ঐ সীটে বসার অধিকার মেলে—এ টাকা আলাদা দিতে হয়—এটা কুণ্ডুদের টিকিটের মধ্যে নয়।

গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে, সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'জয় বদরি-বিশালা কি জয়'। তারপর ড্রাইভার আবাব ধ্বনি দিলেন, 'বোলে বোলে বদরি-বিশালা কি' আমরা বললাম, 'জয়'।

হৃষীকেশের সমতল মাটির বুক ছেড়ে গাড়ি উঠতে লাগল উচুতে, দুই দিকে পাহাড়ের শ্রেণী—নীচে গঙ্গা—এখনো শহর দেখা যাচ্ছে—দেখা যাচ্ছে লছমনঝোলা আর মন্দির। ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে হৃষীকেশ – আমরা উঠছি উপরে। সুমুখের সীটে বসেছেন [illegible]'—দেওর, বৌদি, ভাইঝি। আজ চারদিন ধরে সবাই অবাক হ[illegible] দেখছেন। ভাইঝির শাড়ী-জামা-ব্লাউজ গুছিয়ে দিচ্ছেন কাকা, ব[illegible]র সেবাও করে চলেছেন নিরলস, নীরবতায়। যদিও দলের প্রধান তিনিই, কিন্তু মনে হয় ভাইঝি আর বৌদির সুখ-বিধান কবাই যেন ঐ ভদ্রলোকের ব্রত। আমাদের এতবড় বৃহৎ দলটার কারও সঙ্গেই বেশি মিশতে চান না। এঁরা নিজেদের নিয়েই তৃপ্ত, নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাসীদি এঁদের নাম দিয়েছেন 'আঙ্কেল পার্টি'। আঙ্কেল, আঙ্কেল শুনতে শুনতে ছোট-বেলায় যে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে 'স-রস' উচ্চারণে পড়তাম,—টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল (Twinkle) লিটিল ষ্টার,

হাউ আই ওয়ানডার হোয়াট ইউ আর'—

সেই কবিতাটাই বার বার ঘুরে ঘুরে মনে আসছে।

আমাদের কামরায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা মামী, ভাগিনী, কাকী, মামীর মামী প্রভৃতি মিলে নয়জন। গানে-গল্পে-হাসিতে এঁরা মুখর। ম্যানেজার প্রাণ-প্রাচুর্যে-ভরা এই দলের নাম দিয়েছেন 'জলি পার্টি' (Jolly Party); তাছাড়া ইতিমধ্যে সবাইকারই নামকরণ হয়ে গেছে—বর্ধমান পার্টি, বাকুড়া পার্টি, মানভূম পার্টি। মানভূমের পার্টিতে আছেন এক বুড়ী আর তাঁর বোনঝি। বোনঝিটি যেমন হাসিখুশি, মাসী তেমন রুক্ষভাষী। জানালার ধারে সবাইকে ঠেলেঠুলে ধাক্কা দিয়ে কায়েমী হয়ে বসলেন, 'কেনে? তোমরা বইসবেক্, আমি বইস্‌ব নাই কেনে?' উনি মুখের জোরে যা পারলেন, আমি তো তা পারলাম না। আর একদল এসেছেন ডানকুনি থেকে—ডানকুনি পার্টি। ঐ দলের একটি মহিলাকে উষাদির মত দেখতে। স্বভাবেও যেন মিল আছে—কথা বলে

সুখ পাই, পান খাওয়াতেও দেখি উনি আমাবই জুড়ি। এক হাজার পান কিনে নিয়ে এসেছেন আঠারো দিনের সফরে। 'জলি পার্টি'তেও দেখলাম পান-খাওয়া মহিলা আছেন কয়েকজন, পরিপাটি তাঁদের রূপোর বাটা, পানের কৌটো—সবই ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। আমার কাছে হরিদ্বার থেকে কেনা শ'দেড়েক পান—এক বড় টিনের কৌটায় কাটা-সুপুরি, আর কিছু আস্ত-সুপুরি, খয়ের, চূণ, জাঁতি। এসব সরঞ্জামেই ভরে আছে একটি থলে। কাপড, চাদর অনেক ফেলে রেখে এলাম হৃষীকেশে, কিন্তু পান [illegible] পানের সরঞ্জাম রেখে আসা, 'নৈব নৈব চ।'

বাসের আর এক ধারে জা[illegible]লার পাশে বসেছেন এক দম্পতি,—স্ত্রীটি হাসিখুশি, স্বামী কিছু গম্ভীর। তাঁদের সঙ্গে হঠাৎ এসে জুটেছেন তাঁদেরই প্রতিবেশী এক সুশ্রী যুবক, মাথায় আছে ছিট। তিনি শুনেছেন বদরিনাথে প্রচণ্ড শীত। তাই হরিদ্বার থেকেই গায়ে জড়িয়েছেন ভেস্ট, তার উপরে সার্ট, সার্টের উপরে পুলওভার, তার উপরে কোট, কোটের উপরে শাল, গলা আর কান মাফলার-জডানো, পদযুগলে গরম মোজা, কেডস্ স্থ—মোট কথা শীতাবরণের এক জীবন্ত প্রদর্শনী। তাঁর হাতে, পকেটে নানাবিধ ওষুধের ট্যাবলেট, সর্বক্ষণ একটার পর একটা ওষুধ গলাধঃকরণ করেই চলেছেন। শুনলাম তিনি আবার কবি।

আমাদেব সমস্ত যাত্রীদলের মধ্যে এই একজনই, খুব সম্ভবতঃ অবিবাহিত যুবক, আর দুই একটি কিশোর আছেন। অনূঢ়া কন্যাও আছেন—দুই একজনই মাত্র এঁদের একজনকে দেখেই কবি মানসে জাগল চঞ্চলতা, কণ্ঠে জাগল সুর। কথায় বলে 'তেরাত্তিব,' সেই তিন রাত্রিই বাস হল পাশাপাশি, কবি খাবি খেতে লাগলেন। 'অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও' এমনি কত গানের অঞ্জলি নিবেদিত হতে থাকল সেই মেয়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু হায় কবি! তোমার ভাগ্যই যে অপ্রসন্ন, সুরেব বাঁধনে যাকে বাঁধতে চাও তার মন যে কোথায় কার কাছে বাঁধা পড়ে আছে তা কে জানে?

প্রা[illegible] আমার সঙ্গে বসেছেন এক বৃদ্ধা, পাশে তাঁর ছেলে আর দুটি নাতনী, আর অ[illegible] ধারে জানালার পাশে ছেলের বউ। গাড়ি চলছে, বউ ঢুলছে, শাশুড়ি

হেলছে, বাচ্চাগুলি খেলছে—আর ছেলে সবাইকে সাম্‌লাচ্ছে। বউটির গাড়ি চড়লেই বমি হয়—তাই ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়েছে আগেভাগেই। শাশুড়ির সম্ভবত জ্বর, গা-বমি ভাব, তিনি গাড়ির ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে হেলে পড়ছেন আমার গায়ে। সরবার জায়গা নেই, তবু যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে বসি। ওমা, যে কে সেই!

তাঁর মাথাটা আমাকে বারবার 'ঢু' মারতেই থাকল। কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়! ঠেলে দিয়ে বলি, 'ঠিক হয়ে বসুন [illegible]নি ধড়্‌মড়্‌ করে ওঠেন, একটু টান টান হন, কিন্তু তা বড়জোর দু-চা[illegible]নট। তার পরেই 'যথা পূর্বং'। আর তো পারি না। ছেলেকে বলি, 'মাকে একটু ঠিক করে বসান তো।' ছেলে ডাকে,'মা, মা, একটু চারিদিকে চেয়ে দেখ না, কি চমৎকার, কি সুন্দর দৃশ্য!' 'হুঁ হুঁ' করে চোখ মেলেই মা আবার ঘুমিয়ে পড়েন। পরক্ষণেই আমার কাঁধে মাথাটা রাখেন—বিরক্তিতে আমার মন ভরে যায়। তবুও চুপ করেই থাকি—মনে মনে ভাবি, তীর্থে চলেছি—থাক না বুড়ীর মাথাটা আমার কাঁধে। এও হয়তো তাঁরই উদ্দেশ্যে আমার কিছুটা সেবা! কিন্তু মন কি বেশিক্ষণ উপদেশ শোনে, না কোনো ভাল কথায় ভোলে?

আর একবার মাথাটা ঠেলে দিতেই—থু থু করে খানিকটা 'থুথু' তিনি আমার গায়ের উপরেই ফেললেন—বুঝতে পারি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নয়, ঘুমের ঘোরে। তবু আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল, এবার তীর্থদেবতা, তীর্থযাত্রা—সব কিছু মন থেকে মুছে গেল। তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ছেলে আর ছেলের মাকে সাবধান করলাম। এতক্ষণে দুজনেরই সম্বিৎ ফিরে এল, মাকে ওপাশে সরিয়ে ছেলে এসে বসল আমার পাশে।

গাড়ি চলেছে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে—দুই হাজার, ক্রমে তিন হাজার ফিট উঠছি, নিচে আর কিছু নেই—চারপাশে শুধু উত্তুঙ্গ গিরিশিখর-শ্রেণী। বাঁক ঘুরে ঘুরে এক-একটা পাহাড়ে উঠছে বাস, চড়াইয়ের পথে। পেছনে ফেলে-আসা পথের দিকে নিচে তাকিয়ে ভাবছি, এই তো খানিক আগে ঐখানে ছিলাম, এখন এখানে, তারপর চলেছি কোথায়? যতই উঁচুতে উঠছি, সঙ্কীর্ণ হচ্ছে পথের পরিধি। বাস-এর এক পাশে হয় তো মাত্র দুই হাত জায়গা—তার পরেই গভীর

খাদ। সেই খাদে প্রবাহিতা গঙ্গা, তাঁর তীব্র স্রোত। অপর পাশে অনন্ত গিরিশ্রেণী, ঘন অরণ্য, আর তারই মাঝে মাঝে পাহাড়ের বুকে ছোট ছোট এক-একটি চাষের ক্ষেত। কোথাও কোথাও পথের ধারে খাদের কিনারায় ফুটে আছে নাম-জানা, না-জানা নানা রং-এর ফুল, কোথাও ঘাসের জঙ্গল, কোথাও শুধু পাথর। আগে যত ভয় করেছিলাম, এখন যেন আর তত ভয় নেই—পথের সৌন্দর্য মন ভুলিয়েছে; মনে হচ্ছে বেড়াতে এসেছি এক মনোহর নূতন দেশে।

মাঝে মাঝে নিচে [illegible]ছে, ছোট দুই-একটি গাঁ-এর ছবি, আর তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে পায়ে-হাঁটা দুর্গম পথ—পাকদণ্ডীর রাস্তা। এই পথ দিয়েই যুগ যুগ ধরে পায়ে হেঁটে চলেছেন কত শত শত যাত্রী। গঙ্গার ভীষণ খর-স্রোতের উপরে এপারে ওপারে বাঁধা দুইটি দড়ি, তারই একটিকে ধরে, আর অপরটিতে অতি ধীরে পা ফেলে ফেলে পার হয়েছেন এই খরস্রোতা এইসব তীর্থ-যাত্রীরা, পরিপূর্ণ বিশ্বাসভরে।

কত ঋষি, মুনি, সাধু, তপস্বী-অধ্যুষিত এই দেবতাত্মা হিমালয়। এই তো মহাজ্ঞানী মহাভক্ত উদ্ধবের শেষ-যাত্রাপথ বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে। অন্তরতম শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান অবশ্যম্ভাবী জেনে উদ্ধব লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চরণে। 'ওগো দীনজনশরণ, ওগো ভক্তপ্রাণ, তুমি চলে যাবে বৈকুণ্ঠে, এই মর্ত্যধামে হবে তোমার লীলার অবসান—আমি জানি তুমি চলে যাবে আমাদের ত্যাগ করে। প্রভু গো, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, তোমাকে ছাড়া এ পৃথিবীতে থাকতে পারব না আমি।' মৃদু কণ্ঠে ভগবান বললেন—'উদ্ধব, আমার পরম প্রিয় তুমি—তোমার কাছে রেখে গেলাম আমার শেষ বাণী, আমার জ্ঞান কর্ম-ভক্তিযোগের সম্পুট, তুমি চলে গেলে কে বাঁচাবে এই অসহায়া ধরণীকে, কে মেটাবে ভক্ত-প্রাণের তৃষ্ণা? তুমি চলে যাও বদরিকাশ্রমে, এ মর্ত্যভূমিতে আর তুমি থেকো না। আমি চলে গেলেই কলি তার পূর্ণ আধিপত্য আর প্রভাব বিস্তার করবে। মিথ্যা, ছলনা, অন্যায়ে ভরে যাবে পৃথিবী—অত্যন্ত অশিষ্ট হবে কলিযুগের লোক। তাই, তুমি চলে যাও বদরিকাশ্রমে—আমি

সেখানে আছি নরনারায়ণ-রূপে, আর রইলাম তোমার অন্তরে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে।' প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন উদ্ধব, অশ্রুজলে সিক্ত হল দুই চরণ-কমল—বাক্যহারা উদ্ধব মূর্ছিতের মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। প্রিয়তম, ভক্তের অশ্রুতে বিচলিত হল অন্তর, আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায় ভগবানের চোখেও এল অশ্রু। বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠে ডাকলেন, 'ওঠো আমার প্রিয়তম উদ্ধব। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ নেই—তুমি ওঠো।' উঠে দাঁড়ালেন উদ্ধব, মাথায় প্রভুর পাদুকা, প্রভুকে প্রদক্ষিণ করে তিনি পা বাড়ালেন তীর্থপথে। কিন্তু দেহ-রথ অচল, অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে নেই দৃষ্টি, পথের রেখা শূন্যে বিলীন। তবু যেতে হয়—বার বার পিছন ফিরে তাকান আর এক এক পদ অগ্রসর হন। তারপর একসময় দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে গেল শ্যাম-অঙ্গের স্বুবর্ণ উত্তরীয়-প্রান্ত—আকাশ ঢেকে গেল ঘন কালো মেঘে।

উদ্ধব চলে গেলেন বদরিকাশ্রমে। এদিকে দ্বারকায় নেমে এল ধ্বংসের কালো ছায়া। প্রভাস তীর্থক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে লাগলো সংঘাত, ধ্বংস হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বান্ধব, সমগ্র যাদবকুল। সঙ্কর্ষণ বলরাম দেহত্যাগ করলেন সমুদ্রজলে। সারথি দারুককে শ্রীকৃষ্ণ পাঠালেন হস্তিনায়—অর্জুনকে আনবার জন্যে। লীলা-অবসানের বাসনায় উপবিষ্ট হলেন বৃক্ষতলে, এক চরণের উপরে বিন্যস্ত আর একটি রক্তিম পদতল। মৃগভ্রমে জরা ব্যাধ সেই দেবলাঞ্ছিত চরণে তীরের আঘাত হানল, জরা ব্যাধের লক্ষ্য উপলক্ষ্য মাত্র, ভগবান অন্তর্হিত হলেন। আবির্ভাব-তিরোভাব—জন্ম-মরণ নয়, শুধুই লীলা—দর্শন আর অদর্শন। বিদায়বেলার করুণ মধুর হাস্য-ধারায় রঞ্জিত হল আকাশ, ব্যথাতুরা ধরণীর বক্ষ হল বিদীর্ণ।

অর্জুন এলেন দ্বারকায়। বৃদ্ধ বসুদেব আর তাঁর পত্নীগণ, রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ, রেবতী প্রভৃতি বলরামের পত্নীগণ, আর সমগ্র যাদব রমণীদের সঙ্গে নিয়ে অর্জুন এলেন প্রভাস-তীর্থে। 'নাই নাই, কেউ নাই, শ্রীকৃষ্ণ নাই।' মূর্ছিত অর্জুন, মূর্ছিতা ধরণী, স্তব্ধ আকাশ-বাতাস—শুধুই কান্না। দুঃসহ দৃশ্য, দুঃসহ শোক। বাসুদেব প্রাণত্যাগ করলেন। জ্বলে উঠল শত শত চিতা—যাদব রমণীগণ নিজ নিজ পতিকে আলিঙ্গন করে সহমৃতা হলেন।

কিছু সংখ্যক যাদব রমণীকে সঙ্গে নিয়ে হতোদ্যম হৃতবল অর্জুন স্খলিত পদে ফিরে চললেন হস্তিনায়। পথে একদল দস্যু আক্রমণ করলে তাঁদের। অর্জুন ধনুরুত্তোলন করলেন, গাণ্ডীবধন্বার হাত থেকে খসে পড়ল গাণ্ডীব, লুণ্ঠিতা হলেন যাদব-রমণীরা! পার্থসারথি-বিহীন পার্থ—শক্তি নেই, নেই কোনও সামর্থ্য—চললেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

যুধিষ্ঠির অধীর হয়ে আছেন—কবে গেছে অর্জুন, কত দিন আগে! সখার আহ্বান নিয়ে এসেছিল দারুক, আজও সে ফিরে আসছে না কেন? কেন চারিদিকে নানা দুর্লক্ষণ, উল্কাপাত, রুধির-বৃষ্টি, পেচক-শৃগালের কর্কশ রব? বললেন, 'ভীম, এ কি সর্বনাশের ইঙ্গিত দেখছি চারিদিকে? কেন অর্জুন ফিরে এল না আজও '

হঠাৎ যেন অর্জুনের রথের ক্ষীণ শব্দ কানে এল—উৎকর্ণ যুধিষ্ঠির আর ভীম এসে দাঁড়ালেন বাইরে। ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে—বিরস-বিষণ্ণ মুখে স্খলিত-চরণে আসছেন অর্জুন, উৎসাহহীন উদ্যমবিহীন। 'একি অবস্থা অর্জুনের? সে কি বহন করে নিয়ে আসছে কোন অশুভ বার্তা? না কি সে কোন ঘোরতর অপরাধে শ্রীকৃষ্ণ-বর্জিত হয়েছে, ভীম?' সে যদি কৃষ্ণ-বর্জিত হয়ে থাকে তবে আমাদের এ ছার জীবনে আর কি কাজ? নাকি কৃষ্ণেরই ঘটেছে কোনও অমঙ্গল?'

ধীরে ধীরে পার্থ এসে দাঁড়ালেন অগ্রজের সামনে, নতশিরে অশ্রুসজল-নেত্রে। ছুটে গেলেন যুধিষ্ঠির, 'বল বল অর্জুন, কি হয়েছে তোমার? কৃষ্ণের কথা বল, বল তাঁদের সবাকার কুশলবার্তা।'

অর্জুনের কণ্ঠ রুদ্ধ, নির্বাক রসনা। ব্যগ্র-ব্যাকুল আগ্রহে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'চুপ করে আছ কেন পার্থ? বল কি হয়েছে—তুমি কি কৃষ্ণ-বর্জিত হয়েছ?' 'তাই গো তাই। মহারাজ, কৃষ্ণ-বর্জিত হ'য়েছি আমি, তুমি, যাদব-কুল—সমস্ত পৃথিবী। কৃষ্ণ নাই।' 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, হা প্রাণবল্লভ।' ধরণীতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ-সখী কৃষ্ণা।

'কৃষ্ণ নেই—তবে?' কি হবে এই রাজ্য-ধনে—এই প্রাণ রাখার আর কোন্ প্রয়োজন?'

অগোচরে সম্পূর্ণ হল সমস্ত আয়োজন। পরীক্ষিতের অভিষেক সমাপ্ত হল, শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র জীবিত বংশধর বজ্রকেও অভিষিক্ত করা হল। হস্তিনার রাজ্যভার পরীক্ষিতকে আর মথুরার রাজ্যভার বজ্রকে সমর্পণ করে অগ্রসর হলেন যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের পথে—পশ্চাতে পশ্চাতে চললেন ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা। কৃষ্ণ-বিহীন ভুবনে আর তো চাওয়া-পাওয়ার কিছুই রইল না—'আমরা তোমাকেই শুধু চাই। হে নয়নাভিরাম, হে প্রাণারাম, তুমি দেখা দাও।'

দুর্গম দুরারোহ পথে উত্তুঙ্গ গিরিশিখর থেকে উত্তুঙ্গতর শিখরে চললেন যাত্রীদল। এই তো সেই দেবতাত্মা হিমালয়—এই তো সেই মহাপ্রস্থানের পথ।

'কতদূর, আর কতদূর? কুণ্ঠিত কি বৈকুণ্ঠের দাক্ষিণ্য'? পথেই লুটিয়ে পড়লেন বিবশা দ্রৌপদী। একবারও ফিরে তাকালেন না যুধিষ্ঠির, চললেন তিনি এগিয়ে। তারপর ভূলুণ্ঠিত হলেন কনিষ্ঠ সহদেব, তারপর একে একে নকুল, অর্জুন, ভীম।

তবু ফিরে তাকালেন না যুধিষ্ঠির। চলেছেন, তিনি চলেছেন সমুখপানে—ক্রমেই দুর্গম, দুরারোহ হয়ে উঠ্‌ছে পথ তুষারাস্তীর্ণ অভ্রভেদী হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, তবু ব্যাহত হচ্ছে না তাঁর পথচলা। সারা পথ সঙ্গে এসেছে, এখনও সঙ্গী হয়ে রয়েছে একটি কুকুর। পথেরও শেষ আছে। অবশেষে যুধিষ্ঠির এলেন মর্ত্যের শেষ-সীমান্তে, স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে। উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রথ নিয়ে এগিয়ে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। সসম্ভ্রমে বললেন, 'স্বর্গ আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে ধর্মরাজ, মহাপুণ্যবান আপনি। রথে আরোহণ করুন।'

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির—পরম স্নেহে ধরে রয়েছেন কুকুরটিকে।

'না, না ধর্মরাজ, কুকুর পরিত্যাগ করে আপনি একাকী রথে আরোহণ করুন, পবিত্র স্বর্গধামে হীন পশুর তো স্থান নাই।'

'তবে স্বর্গে আমারও প্রয়োজন নাই।'

শান্ত প্রসন্ন মুখে ফিরে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির, পা রাখলেন মর্ত্যের সীমানায়।

যুধিষ্ঠির উত্তীর্ণ হলেন জীবনের শেষ পরীক্ষায়। উজ্জ্বল স্মিত মুখে সমুখে এসে দাঁড়ালেন, ধর্ম। কুকুর অন্তর্হিত।

মর্ত্য-দেহধারী এক মানুষ, পূত ভারতের পুণ্যসমুজ্জ্বল এক অনন্য পুরুষ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গেলেন সশরীরে।

এই তো সেই স্বর্গের পথ, দ্রুতগামী যানে চলেছি ঔদ্ধত্য আর ভক্তিহীন স্পর্দ্ধায়। যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তবে এই যন্ত্রযানেই দ্রুত পৌঁছে যাব বদরিনাথের মন্দির-দুয়ারে।

আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিষ্ণুচরণ কমলোদ্ভবা দ্রবময়ী দেবী জাহ্নবী, শশাঙ্কশেখরের শিরোজটাভার থেকে নেমে শিখরে শিখরে প্রাণোৎফুল্ল বালিকার মতই চঞ্চল নৃত্যছন্দে তিনি নেমে আসছেন মর্ত্যের কলুষলিপ্ত তৃষ্ণাহত সন্তানদের কাছে, মূর্তিমতী করুণারূপে। ধন্য পুণ্যবান আর এক ভারতসন্তান ভগীরথ, তাঁরই তপস্যায় ভারতভূমিতে অবতীর্ণা হয়েছিলেন ভাগীরথী।

দুই পাশে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী—মাঝখানে গভীর খাদ, তারই মধ্য দিয়ে বিশাল বিরাট পাথর ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তীব্র গর্জনে বয়ে চলেছেন ভাগীরথী। ভয়ে ও আতঙ্কে বার বার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে—এক একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছি, আর সবাই আর্তস্বরে ডেকে চলেছেন, 'বদরিনারায়ণ হরি। দয়া কর, রক্ষা কর ঠাকুর।' জানি না, আমাদের যাত্রা নিরঙ্কুশ হবে কিনা। বাস যদি সামান্যও এদিক-ওদিক হয় তাহলেই অতল সমাধি। সত্য কথা, আশঙ্কায় ও আতঙ্কে বিস্ফারিত আমাদের চোখ, কিন্তু হিমালয়ের মহিমার কাছে ক্ষণে ক্ষণেই পরাভূত হচ্ছে সে আশঙ্কা-আতঙ্ক। মন বলছে—'চেয়ে দেখ ওরে মূঢ় নয়ন, একবার চেয়ে দেখ। এই সুন্দরের মাধুরীতে ভৃঙ্গের মত লীন হয়ে থাক—হৃদয় ভরে নাও এই মহিমায়।'

বেলা নয়টায়, খুব সম্ভবত ব্যাসঘাটের কাছে এসে বাস থামল। ক্ষণিক বিশ্রাম। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কুণ্ডু স্পেশ্যালের লোক, পথের মধ্যেই বিরাট স্টোভ জ্বেলে চা-জলখাবার করে দিল তারা।

দেবপ্রয়াগ

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার বাস ছাড়ল। বেলা প্রায় দশটায় বাস এসে থামল দেবপ্রয়াগে। এখানে স্বর্গের নদী অলকানন্দা এসে মিলিতা হয়েছেন ভাগীরথীর সঙ্গে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধারার সঙ্গম।

যাঁরা পায়ে হেঁটে আসেন তাঁদের এখানে আসতেই লাগে ছয়-সাত দিন। কত কষ্ট, কত দুঃখের রাত্রি পার হয়ে তাঁরা আসেন অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম-তীরে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহগুলি স্নিগ্ধ শীতল হয়ে যায় স্রোতস্বিনীর স্পর্শে। তারা এখানে মাথা মুণ্ডন করেন, স্নান করেন, তর্পণ করেন পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে।

আমরা এসেছি বেড়াতে। সাত দিনের পথ পাঁচ ঘণ্টায় অতিক্রম করে এলাম। আছি উঁচুতে, উপর থেকেই দেখলাম সেই সঙ্গমেব মিলিত ধারা, প্রণাম করলাম যুক্তকরে, কিন্তু পারলাম না স্পর্শ করতে—স্নান তর্পণ তো দূরের কথা।

শ্রীনগর

কয়েক মিনিট পরেই বাস ছেড়ে দিল, বেলা প্রায় বারোটায় এলাম শ্রীনগর। শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজ্যের ছোটখাটো একটি শহর। দোকান-পাট, হোটেল, অফিস আছে; মোটামুটি ভালোই। আমাদের এক রেস্ট হাউসে ওঠান হল। স্নানের ঘর, শৌচাগার—সবই আছে, ব্যবস্থাও সবই আধুনিক। বিরাট এক হল ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম সবাই। যাঁদের দরকার তাঁরা স্নানটান সেরে নিলেন, আমার তো তিন বার স্নান করা অভ্যাস; হৃষীকেশে সকালের স্নান করে এসেছি, এখন অন্তত গায়ে-মাথায় একটু জল না দিলে আমার খুবই অস্বস্তি লাগবে। স্নান সেরে এসেই দেখি আহার্য প্রায়-প্রস্তুত। আশি জনের মত আছি আমরা। এরি মধ্যে লুচি তৈরী হয়ে গেছে—সঙ্গে আলুর দম, বেগুন-ভাজা। অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। কুণ্ডুর ওরা মানুষ না যন্ত্র। মিষ্টিও কখন যেন যোগাড় করা হয়েছে, রীতিমত

ভূরি ভোজন! রাস্তায়, বারান্দায় গাড়োয়ালি মেয়ে-পুরুষেরা নিয়ে এসেছে তাদের বেসাতি—গরম জামা, সোয়েটার, চাদর। দামে যথেষ্ট সস্তা। প্রচুর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সস্তা পেয়ে কিনে নিচ্ছেন অনেকেই। ইয়াহিয়ার কল্যাণে তো শীতের গাত্রবস্ত্র, লেপ-কাঁথা, কিছুই আমাদের নেই ; এসেছি ধার-করা এক-আধটা গরম জামা নিয়ে, কাজেই ওই সব শীতবস্ত্রের আমার দরকার খুব বেশি ; কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, তীর্থ-দর্শনের আগে আমি কিছুই কিনব না। শুধু কয়েকটি আপেল নিলাম তীর্থে নিবেদন করবার জন্যে।

বেলা প্রায় দুইটায় বাস ছাড়ল। এতক্ষণ রাস্তা খুব প্রশস্ত না হলেও একেবারে সঙ্কীর্ণ ছিল না। মাঝে মাঝে ফিরতি দুই-একটা বাস বা জিপ এসে পড়লেও একটা একটু পেছনে সরে আর একটা একটু এগিয়ে, পাশ কাটিয়ে কোনও মতে পার হয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু এখন থেকে 'ওয়ান-ওয়ে'। ছাড়পত্র না পেলে, অর্থাৎ ওদিক থেকে শেষ বাস এসে না পৌছালে এদিককার বাস ছাড়তে পারবে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে লাল নিশানের সংকেত নিয়ে শেষ ফিরতি বাস এসে দাঁড়াল। আবার আমাদের বাসেও লাল নিশান বেঁধে দেওয়া হল—অন্যান্য বাসগুলো আগে-আগে, আমরা চললাম সবশেষে। আমরা গিয়ে পিপুলকোটি চটিতে পৌছবার আগে ওদিক থেকে আর বাস ছাড়বে না।

বাস চলছে। রাস্তা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, এক একটা বৃহৎ চড়াই উঠতে সময় লাগছে অনেক, বাঁকের পর বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছি—মনে হচ্ছে একই জায়গায় যেন ঘুরছি। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে তীব্রস্রোতা অলকানন্দা—বয়ে চলেছেন সগর্জনে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে ঝর্ণাধারা—পথ প্লাবিত হচ্ছে ধারাস্রোতে, তার উপর দিয়েই ধীরে ধীরে বাস পার হচ্ছে—বহু এবড়ো-খেবড়ো কর্কশ পাথর, পিচ্ছিল পাথর ছড়িয়ে আছে পথে ; জলের প্রবল স্রোতে যদি তার একটাও সরে যায় তাহলে গাড়ির সঙ্গে আমরাও সরে যাব জন্মের তরে।

রুদ্রপ্রয়াগ

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস এসে থামল রুদ্রপ্রয়াগে। এখানে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম। আমরা তীর্থযাত্রী, কিন্তু তীর্থকে রেখে যাচ্ছি পথে পথে— নামবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই, আমরা কুণ্ড স্পেশ্যালের রুটিনে বাঁধা।

সমস্ত মায়া-মোহ, গ্লানি ত্যাগ করে পায়ে-হাঁটা যাত্রী যাঁরা আসতেন, সারাদিন অসহ্য কষ্ট সয়ে, দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে চলত তাঁদের ভক্তিপ্লুত অব্যাহত যাত্রা, রাত্রিতে চটিতে-চটিতে বিশ্রাম করে, সমস্ত তীর্থের কৃত্য সম্পন্ন করে একমাস দেড়মাসে গিয়ে পৌছাতেন তাঁর সর্বতীর্থের পতি পরমদেবতার পদপ্রান্তে। তাঁদের এ দুঃখবহন ব্যর্থ হত না, তাঁরা পেতেন দেবতার প্রসাদ। আর আমরা চলেছি টাকার জোরে যন্ত্ররথে বসে, সেখান থেকে নেমে না দাঁড়লে দেবতার চরণধূলা পাবো কোথায়, কেমন করেই বা তাঁর চরধূণলায়-ধূলায় ধূসব হব!

পথের মাঝে মাঝে আমাদের চা-খাবার, আরামপ্রদ বিশ্রামাগার, আমরা চলেছি যেন প্রমোদ-ভ্রমণে। তবু দেবতার দয়ার স্পর্শ লেগেছে অন্তরে। শত আতঙ্ক, শত ভয়ের মধ্যেও অনুভব করছি অনুপম প্রেম। তিনিই তো টেনেছেন, আবার তিনিই নিয়ে যাবেন তাঁর চরণতলে।

রুদ্রপ্রয়াগ একটি ছোট্ট শহর—সরকারী বাঙলো, ধর্মশালা, ডাকঘর, বাজার আছে। মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান যথেষ্ট। এদিকে এক বিশেষত্ব দেখলাম, পথে-বাজারে বিরাট বিরাট শশা, এত বড় শশা আমাদের দেশে হয় না, এর স্বাদও আলাদা।

আমি বাসে উঠেই দেখেছিলাম সবার হাতে হাতে পর্বতারোহণের জন্যে এক-একটি লাঠি। জানতাম না যে, হরিদ্বার ছাড়া আর কোথাও এরকম লাঠি পাওয়া যায় না। যত চটিতে গাড়ি থামছে সেসব জায়গারই বাজারগুলোতে গিয়ে লাঠির খোঁজ করছি, কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। পরবর্তী চটিতে মিলবে ভরসা দিচ্ছে আগের চটির আর বাজারের লোকেরা। শ্রীনগর যে এত সমৃদ্ধ জায়গা সেখানেও পেলাম না। এখন রুদ্রপ্রয়াগে অনেকেই শশা কিনে খাচ্ছেন, কেউ কেউ চা-মিষ্টি, আমি খুঁজছি লাঠি। এখানেও মিললো না।

ম্যানেজার অমরবাবুকে চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করলাম—'আমি যে লাঠি পেলাম না?' ততোধিক চিন্তিত মুখ করে ম্যানেজার বললেন—'তাহলে কি হবে?'

আমি রাগ করে বললাম, 'ঠাট্টা রাখুন—আমাকে লাঠি যোগাড় করে দিতেই হবে।'

রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম। কি অপূর্ব নাম! অলকানন্দা এসেছেন স্বর্গ থেকে (বদরিনারায়ণজীর দিক থেকে) আর মন্দাকিনী এসেছেন ব্রহ্মলোক থেকে (কেদারনাথজীর দিক থেকে)।

প্রবাদ এই, এই সঙ্গমে অভিষিক্ত হয়ে দুইলক্ষ শাপগ্রস্ত ব্রহ্মরাক্ষস মুক্তি লাভ করেছিলেন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পথ দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে—একটি গিয়েছে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে অলকানন্দার তীর ধরে সোজা বদরিকাশ্রমে। আর একটি গিয়েছে মন্দাকিনীর তীবে তীরে কেদারনাথের দিকে।

আমরা এখান থেকেই কর্ণপ্রয়াগের পথ ধরবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছাড়ল, ছোট একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে বাস্ পার হয়ে এল। পেছনে পড়ে রইলো লোকালয়, জনহীন নিস্তব্ধ বন্ধুর পথে আবার আমাদের যাত্রা হল সুরু। কি মহান অথচ কি ভীষণ সে পথ। সঙ্কীর্ণ পথের একদিকে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী, আর একদিকে অতলস্পর্শী খাদ। পথে পথেই প্রবলবেগে নেমে আসছে অসংখ্য দুরন্ত গিরিকন্যা ঝর্ণাধারা, স্ফটিকশুভ্র বরফগলা জল বুকে নিয়ে; তারা প্রাণচঞ্চল কিশোরীর মতই চলেছে নেচে নেচে। দেখবো দুটি নয়ন মেলে, না বন্ধ করবো আতঙ্কে?

বেলা পড়ে আসছে—গাড়ি চলেছে, আমরা চলেছি কর্ণপ্রয়াগের পথে।

কর্ণপ্রয়াগ

গঙ্গা আর অলকানন্দার সঙ্গম। চামোলি শহর। বিরাট বিরাট পাথর ডিঙিয়ে লাফিয়ে সগর্জনে বয়ে চলেছেন তিনটি দেবস্রোতস্বিনী—তিনটি মিলিত ধারার সঙ্গমে এখানে নদী প্রশস্ত। যেখানে একটি মাত্র ধারা সেখানে নদীর বিস্তার কম, গভীরতাও কম—কিন্তু কী তীব্র স্রোত! মনে হয় দেবরাজ

ইন্দ্রের ঐরাবতও যদি একবার এই স্রোতে পড়ে যায় তাহলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে মুহূর্তে।

প্রবাদ আছে, এখানে এই সঙ্গমের তীরে মহাভারতের কর্ণ একদিন পিতা সূর্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন এবং সেদিনই পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন অভেদ্য কবচ আর কুণ্ডল।

অবশ্য মহাভারতে অন্য কথাই বলে—কর্ণের কবচ আর কুণ্ডল ছিল সহজাত—ইন্দ্র কর্ণের কাছ থেকে ছলনা করে এই কবচ আর কুণ্ডল নিয়ে গিয়েছিলেন। আপন বরপুত্র অর্জুন যেন সহজেই বধ করতে পারেন কর্ণকে এই ছিল ইন্দ্রের উদ্দেশ্য। আজন্ম-দাতা কর্ণ অক্লেশেই ইন্দ্রকে দান করেছিলেন সেই দুর্জেয় কবচ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে।'

মহাপ্রাণ মহীরথী কর্ণকে এই প্রয়াগে রেখে আমরা চললাম নন্দপ্রয়াগের উদ্দেশ্যে।

আমাদের গাড়িতে সুধীর আর তিন চারজন পরিচারক বসে ঢুলছে—এ ওর গায়ে পড়ছে, উঠছে, ঘুমুচ্ছে। বেচারীরা সারাদিন খাটে, এতগুলো যাত্রীর খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করা, বাক্স-বিছানা দিনের মধ্যে একবার করে বাঁধা আর একবার করে খোলা, ওঠানো-নামানো, সবই তো করতে হচ্ছে যন্ত্রের মত। গাড়িতে উঠেই বলেছে, 'আমাদের ক'জনাকে একধারে বসতে দিন মা, আমরা কিন্তু গাড়ি চলতে আরম্ভ করলেই ঘুমিয়ে পড়ব।'

পথের মহিমা বা আতঙ্ক কোনটাই ওদের ছুঁতে পারছে না। কতবার আসা-যাওয়া করতে হয়, সবই তো ওদের জানা—পথ-ঘাট, চটি-ঘাটি কোথায় কি সবই মুখস্ত, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই অবিকল সব কিছুর হদিস দিতে পারে।

ওদের বলি, 'বাবা, তোমাদের কি সৌভাগ্য! কুণ্ডু স্পেশ্যালের দৌলতে ঘুরে বেড়াচ্ছো, সারা ভারতে—সমস্ত তীর্থে-তীর্থে।' তারা শুনে অবজ্ঞার-হাসি হাসে।

আমাদের সঙ্গের 'জলি পার্টি' কেবল যে 'জলি' (jolly) তা নয় এঁরা 'হোলি' (holy)-ও। প্রায় সবাই ভক্ত—বিশেষ করে মঙ্গুদি ও তাঁদের কাকীকে দেখলে, তাঁদের ভাবগম্ভীর কথা শুনলে শ্রদ্ধা জাগে। একজন

আছেন, সম্ভবত তাঁর নাম 'নীলু', তিনি গায়িকা; মামীদিও গাইতে পারেন। যখনই রাস্তা হয়ে উঠে সঙ্কটজনক, অতি দুর্গম, তখনই এঁরা উচ্চ কণ্ঠে গান ধরেন, ভগবানের নাম-কীর্তন করেন সমবেত সুমধুর কণ্ঠে। আমিও যোগ দিই —কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কি! ভয় আমাকে চেপে ধরে, গানের ফাঁকে ফাঁকে আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠি, 'রক্ষা কর নারায়ণ!' কেউ কেউ চোখ বুজে প্রার্থনা আরম্ভ করেন—কেউ বা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন। একটা সঙ্কট পার হলে কয়েক মিনিটের স্বস্তি, কিন্তু কতক্ষণ? সামনে ঐ দেখা যাচ্ছে সঙ্কীর্ণ পথ-রেখা—একদিকে গাড়ির গায়েই যেন ঝুঁকে আছে বিরাট বিরাট পাথর, গাড়ির আধ-হাত এক-হাত নিচেই অতল গহ্বর, মাঝে খরস্রোতা প্রবাহিণী সগর্জনে পাহাড় থেকে নেমে আসছে শত ঝর্ণা-ধারায়—সঙ্কীর্ণ উপলসঙ্কুল পথ প্লাবিত হচ্ছে জলে। আমরা যেন হিমালয়ের হাতের ক্রীড়নক মাত্র, তাঁর খেলাচ্ছলে মুহূর্তেই হতে পারি চূর্ণবিচূর্ণ, আবার জীবন নিয়ে পৌছাতেও পারি পরমতীর্থে।

নন্দপ্রয়াগ

এখানে আছে থানা, হাসপাতাল, সেনানিবাস। এখানে নন্দা (নন্দাকিনী) আর অলকানন্দার সঙ্গম।

প্রবাদ আছে—রাজা নন্দ এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। এই নন্দ কি কৃষ্ণের পিতা? জানি না এ কোন্ নন্দরাজা। তাঁর পরিচয় না পেয়েই এগিয়ে চললাম আমাদের গন্তব্য পথে।

যে বাতিকগ্রস্ত যুবকটি চলেছেন আমাদের সঙ্গে, তাঁর সমস্ত শীতনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ভেদ করে, শরীর থেকে অজস্র ধারায় ঘাম ঝরছে। সঙ্গী-দম্পতি বার বার বলছেন, 'খুলে ফেল না জামা-সোয়েটার, এমন কি শীত লাগছে তোমার?' মৌন মূক কবি একদৃষ্টে তাকাচ্ছেন ক্ষণে হিমালয়ের দিকে, ক্ষণে তাঁর মানসীর দিকে, কিন্তু দুই-ই অচল অটল! কাল রাত্রিতে কবি অসুস্থ ছিলেন জ্বর-আমাশয়ে, কিন্তু গাড়ি থামার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যা পাচ্ছেন—বাদাম, পুরী, মিষ্টি সবই কিনেছেন। সে সবই একে একে বিলীন হচ্ছে মুখগহ্বরে। আবার, মুড়ি-মুড়কির মত একই সঙ্গে খেয়ে চলেছেন ওষুধের বড়ি। কারো

কথায় কর্ণপাত নেই। শুধু মাঝে মাঝে স্মিত-হাস্যমুখে উঠছেন গুণগুণিয়ে; বলা বাহুল্য সবই কবির হতাশাভরা ব্যর্থ প্রেমের উচ্ছ্বাস।

আমাদের দুই নম্বর বাসে আছেন ম্যানেজার অমরবাবু। কবির নাড়ীর স্পন্দন বুঝি বা তিনিই ঠিক বুঝে নিয়েছেন। তাই, বাস থামলেই কবি ছুটে যান তাঁর কাছে, কণ্ঠ আলিঙ্গন করে জানান তার মনের গোপন ব্যথা, ম্যানেজার তাঁকে কি আশ্বাস দেন কে জানে? কবি খুশী হয়ে ফিরে আসেন।

ভাগ্যে এই কবি ছিলেন আমাদের বাসেই, তাই এত ভয়ের মধ্যেও হাসতে পারছি আমরা।

সুধীর-ওরা বলছে পিপুলকোটি চটিতে পৌছতে রাত্রি হয়ে যাবে। শৃঙ্গে-শৃঙ্গে অবরুদ্ধ আকাশ, সূর্যের আলো নিবে আসছে, সন্ধ্যা আসন্ন। 'হে নারায়ণ, এই পথে কেমন করে চলবে গাড়ি? যদি রাত্রি আসে তবে কেমন করে উত্তীর্ণ হব এই বন্ধুর পথ?

সন্ধ্যা হয়-হয়—দূরে দেখা যাচ্ছে আলোর রেখা, কানে আসছে মানুষের ক্ষীণ স্বর। তাহলে পিপুলকোটিতে এসে গেলাম। আঃ কি এ-শান্তি, কি অপরিসীম আনন্দ, কি মহান মুক্তি।

পিপুলকোটি চটি

সন্ধ্যার মুখে বাস এসে থামল চটির কাছে। আজকের মত যাত্রা শেষ। এতক্ষণ ছিলাম যেন মেঘলোকে, এবার আবার পেলাম মর্ত্যের ছোঁওয়া। চা, মিষ্টির দোকান চটির সামনেই, সঙ্গে ছোটখাটো একটি বাজার। চটির দোতলা দালানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে থেকেই। এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বলাইবাবু আর ছড়িদার গিরিজা আগের দিন এসেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বাসের থেকে নেমেই ম্যানেজারের নির্দিষ্ট ঘরে ঘরে আমরা গিয়ে হাত-পা মেলে বসলাম। বাসের ছাদের থেকে যাত্রীদের মালের পাহাড় নামাচ্ছে কুলিরা। যাঁর যাঁর লেবেল দেখে পৌছে দিচ্ছে ঘরে ঘরে। বিছানা আসতেই যাঁর যাঁর সীট সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে, যাঁর যাঁর দলের সবাই এক সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে এরি মধ্যে শুয়ে পড়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবিকা (যাঁর

এক পা অক্ষম) কিরণদিও দেখি জলি পার্টির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছেন। আমিই একমাত্র দলছাড়া স্বতন্ত্র সদস্য, কাজেই ঠেলা খেতে খেতে এক পাশে, অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে সরে এসে আমার দীন শয্যা বিছিয়ে নিলাম।

চা, আর সামান্য কিছু খাবার নিয়ে হাজির হল সুবীর। একটু একটু শীত আরম্ভ হয়েছে এবার। কাজেই গরম চা পেয়ে খুশীতে মন ভরে উঠল —তাজা হয়ে উঠলাম। বাইরে কল, বাথরুম, সব ব্যবস্থাই চমৎকার—স্নান করে এসে এবার আমিও শ্রান্ত দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দিলাম।

আমরা এতক্ষণ সবাই ছিলাম ভয়ের সীমানায়, এখন আছি নিরাপদ আশ্রয়ে; কাজেই সারাদিনের মৌন স্তব্ধতা মুখর হয়ে উঠেছে। দোতলায় স্থান পেয়েছেন অনেকে। 'আঙ্কল' পার্টি, বর্ধমান পার্টি, ডানকুনি-দিদিরা সবাই ঢালা বিছানা করে শুয়ে পড়েছেন। সেই কবি আর তাঁর দুই সঙ্গীর বিছানাও পড়েছে তাঁর মানসীর পাশেই। কবির মর্মোচ্ছ্বাস তাই উঠেছে বেড়ে—সঙ্গিনী মাতৃসমা মহিলা আর সামলাতে না পেরে ছুটে এসেছেন নিচতলায় 'জলি' পার্টির কাছে। তাঁদের ফিসফাস কথা আর হাসির হুল্লোড়ে ঘর গম্ গম্ করে উঠ্ছে।

বর্ধমান পার্টিতে এসেছেন সস্ত্রীক জন-দুই ভদ্রলোক। তাঁদের সঙ্গে মিশে গেছেন রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন। ভদ্রলোক অমরনাথ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ ঘুরে এসেছেন। পাহাড় চড়ার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে, আর আছে রসবোধ। জনা-চারেক প্রায়-বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফাঁক পেলেই তাস খেলতে বসে যান। বার্ধক্য তাঁদের দেহে, কিন্তু মনে নয়। বর্ধমানের স্বামী তাঁর স্ত্রীকে ডাকছেন—'ওগো শুনে যাও, একটু এদিকে সরে এসো তো।' স্ত্রী জমিয়ে বসেছেন তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে—যৌবন বিগতপ্রায়—লজ্জাও করে, একটু যেন বিরক্তির সুরেই বললেন, 'ওখান থেকেই বলনা কি বলবে?'

'আরে বাপু, সবেই এস না কাছে—কথাটা খুবই গোপনীয়।'

স্ত্রী অগত্যা কাছেই এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন সেই সিভিল সার্জন—শোনা-যায়-মত ফিস্ফিস্ করে বললেন, "মিসেস চক্রবর্তী, আমার কাছে গোপনে বলুন তো উনি কি বলে গেলেন?"

স্বামী বলে উঠলেন—'খবরদার মশাই, আমাদের দাম্পত্য-আলাপে

আপনি কেন নাক ঢোকাচ্ছেন? আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কি গোপন কথা?'

সিভিল সার্জন হেসে উঠে বললেন,—"আলবৎ নাক ঢোকাব, তীর্থে এসে আবার এত দাম্পত্য-প্রেমের ছড়াছড়ি কেন? এসেছি এক সঙ্গে, যাচ্ছি এক সঙ্গে, যা বলবেন সবার সামনে বলতে হবে, যা শোনার তা সবাই শুনব।'

এমনি চলছে দুই বৃদ্ধের হাসি-ঠাট্টা—আমরাও উপভোগ করছি—হাসিতে আনন্দে গমগম করছে পিপুলকোটি চটি।

কিন্তু হায়! আমার যে লাঠি নেই। উঠে পড়লাম, বাজারে গিয়ে ঘুরে ঘুরে কত খুঁজলাম—এত বন, এত গাছ হিমালয়ে থাকতে আমার একটা সামান্য লাঠি মিলল না! অবশেষে এক ছোকরাকে ধরে আমার 'বিশুদ্ধ' হিন্দীতে কত মিনতি, কত না প্রলোভন দেখালাম, 'বাবা! হাম্‌কো একটা লাঠি আন্‌কে দেও—হাম তুম্‌কো রুপেয়া দেঙ্গা। দেখো কেতনা বাজারমে খোঁজা, তবু হামকো একঠো লাঠি নেই মিলা।'

ছোক্‌রা 'জরুর, জরুর' বলতে বলতে কোথায় যে গেল, বলে গেল—'একটু সবুর কর মাইজি, নিয়ে আসছি লাঠি।'

তার পথের দিকে তাকিয়ে থাকি—একবার এসে ঘরে ঢুকি, আবার যাই রাস্তায়। কিন্তু লাঠি দূরে থাক্‌, ছোকরার দর্শনই আর পেলাম না।

রাত্রি দশটা বাজে—ভাত-তরকারী রান্না সারা—খাবার ডাক পড়েছে। কি আর করি, চলে এলাম ঘরে। দেখি, চটিওলা বসে আছেন কাছে। তাঁকে বললাম, 'এ বাবা, হামারা তো লাঠি নেই হ্যায়—একঠো লাঠি যোগাড় করকে দিজিয়ে না জী'। চটিওলা বললেন, 'লাঠি আছে একটা তাঁর কাছে, কিন্তু মূল্য দিতে হবে চার টাকা'। 'চার টাকা! সামান্য একটা বাঁশের লাঠির দাম? একটু বেশি বলছেন না? দিন, তাই দিন।' তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে এলাম। আমার বহু কামনার ধন লাঠি হাতে পেলাম, না স্বর্গ পেলাম। চটি-ওলা দু' টাকাই নিলেন, ঠাট্টা করে বলেছিলেন চার টাকা।

এগারোটা নাগাদ শুয়ে পড়া গেল। ভোর তিনটায় উঠতে হবে—বদরিনাথ-যাত্রা শুরু হবে পাঁচটায়।

১১ সেপ্টেম্বর, '৭৩

রাত্রে ঘুমটা ভালই হয়েছিল। ভোর তিনটা না বাজতেই ঘরে কলরব শুরু হয়ে গেছে, উপরতলা-নিচতলার প্রায় সব মহিলাই বাইরে বেরিয়ে এসেছেন—ভেবেছেন অন্যে উঠবার আগেই প্রাতঃকৃত্য সেরে নেবেন। কিন্তু গরজ বড বালাই—বাথরুমের সামনে লম্বা সারি, মহিলাই সব, নিরুপায় পুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছেন বহুদূরে, 'লাইন ক্লিয়ার' হতে অনেক দেরী।

এদিকে বাসে তোলবার জিনিসপত্র গোছানো হচ্ছে—সুধীর-ওরাই চট্‌পট্ সবাকাব বিছানা বেঁধে দিচ্ছে—প্লাষ্টিক দিয়ে মোড়া হচ্ছে বাক্স-বিছানা—হিমালয়ের আবহাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই—কখন্ বৃষ্টি আসবে তা বলা যায় না—তাই এই সতর্কতা। আমি দেখলাম 'লাইনে' ঢোকার অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরী, নিজেই তাই বিছানা-বাক্স বাঁধাছাদা আরম্ভ কবলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম। যা হোক্, লাইন শেষ হয়ে এসেছে।

স্নানান্তে হালুয়া সহযোগে গরম চা পান করে বাসে গিয়ে উঠলাম। আজও পূর্বদিনের ব্যবস্থাই বহাল রইল—ম্যানেজার বললেন, 'যে যার পূর্ব-নির্দিষ্ট সীটে বসুন'। যথা আজ্ঞা। আজও আমার জানালার ধারে বসার সৌভাগ্য হল না। যাত্রা শুরু হল। 'জয় বদরী-বিশালা কি জয়'। যদি পথে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তবে আজই পৌছে যাব তোমার মন্দির দ্বারে, তোমার চরণপ্রান্তে।

দূরে পড়ে রইল পিপুলকোটি, মর্ত্যের স্পর্শ টুকু ছাড়িয়ে আবার চলেছি মেঘলোকের মধ্য দিয়ে অলকানন্দাকে সঙ্গে নিয়ে অলকাব পানে। পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে—কোথাও মেঘাবৃত শুভ্রকিরীটি এক-একটি শৃঙ্গ মানুষকে ডাক দিচ্ছে অনন্তের পানে, কোথাও যেন কাটা-কাটা বিরাট জমাট পাথব, কোথাও ধূসর, কোথাও পীত, কোথাও নাঙা, কোথাও আবাব সবুজ, হলুদ, লাল, বেগুনী নানা রং-এর ফুলের সমারোহ। নিচে বিরাট বিরাট পাথর ডিঙিয়ে, লাফিয়ে ফুলে-ফেঁপে সগর্জনে বয়ে চলেছেন অলকানন্দা। পাহাড়ের চূড়া থেকে শতধারায় নেমে আসছে ঝর্ণা। এদিকে আকাশ ঢেকে গেল মেঘে—বৃষ্টি নামল ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর প্রবল ধারায়, পথ সংকীর্ণ

দুর্গম, পিচ্ছিল, ধ্বস নামছে—ঝুর্‌-ঝুর্‌ করে খসে পড়ছে পাথর আর পাহাড়ী মাটি। আমাদের বাস থেমে আছে পার হবার উপায় নেই। আমরা এখন আছি পাঁচ-ছয় হাজার ফিট উপরে। হিমালয় পথ না দিলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এখানেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিটারী এল, এল বুলডজার—আধ-ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা কিছুটা পরিষ্কার করা হলে, ধীরে ধীরে বাস চলল এগিয়ে। যাত্রীরা সমস্বরে ডাকছেন, 'নারায়ণ নারায়ণ, রক্ষা করো, কৃপা করো প্রভু'।

পথে পথে ছুঁয়ে গেলাম গরুড়-গঙ্গা আর পাতাল-গঙ্গা। বৃষ্টি চলছে অবিরাম! আবার থেমেও গেল ঘণ্টা দুই পরে। পথে পার হয়ে এলাম যোশী মঠ। শুধুই দূরদর্শন, এখন এখানে নামা হবে না, ফিরবার পথে হয়তো নামব, দেখে যাব এই মঠ। আমরা এসে পৌঁছলাম বিষ্ণুপ্রয়াগে, এখানে অলকানন্দা আর ধলী-গঙ্গার সঙ্গম, এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি সেনাবাহিনীর তৎপরতা। রাস্তা মেরামত হচ্ছে, ছাউনি পড়েছে পথের প্রান্তে, পাহাড়ের গায়ে, সামনেই পাণ্ডুবোশ্বর সাতহাজার ফিট উপরে। পাণ্ডুবোশ্বর সুন্দর রাস্তা, থানা সেনানিবাস, রীতিমত জমজমাট এক শহর। হায় রে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, এত উঁচুতে থেকেও তুমি অক্ষত রইলে না! কলিকালের মানুষের এ কী প্রচণ্ড লোভ যা তাকে এমন অনাচারে প্রবৃত্ত করেছে! ধরাতলের স্বর্গখণ্ডকে সে পরিণত করেছে ভোগমুখীন শহরে। বদরিনাথের অদূরেই চীনসীমান্ত। আমাদের পথ চলেছে চড়াই-এর দিকে, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অতিক্রম করে চলছে আমাদের বাস, আমরা বসে আছি বিনা কষ্টে, চলেছি তীর্থরাজের দর্শনে। যুগ যুগ ধরে যাঁরা পায়ে হেঁটে এসেছেন, কি দুঃসহ কষ্ট বরণ করতে হয়েছে তাঁদের এই চড়াই ভাঙতে। কর্কশ পাথরের আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে পা, হাতের আঙুলগুলো কেটে গেছে, সারা গায়ে, মাথায় মাছি আর বিষাক্ত পোকার, কামড়। লাঠি ধরে একে একে সরু পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে চলেছেন শ্রান্ত ক্লান্ত দিশাহারা যাত্রীরা, কোথায় দিশারী, কোথায় তুমি হে ভক্তবৎসল অকূলের দিশারী, দয়া কর, উত্তীর্ণ কর তোমার পদপ্রান্তে। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না পথের শেষ, চড়াই-এ ওঠার সময় বুক ফেটে যেতে চায়, পা ভেঙে আসে, দেহ শীর্ণ জীর্ণ; আর তো

চলার সাধ্য নেই। তবু চলেছেন তাঁরা বদরি-বিশালকে স্মরণ করে করে। পথে পড়েছে তীব্রস্রোতা নদী, দুই পাহাড়ের পাথরে বাঁধা মোটা দড়ি, নদী পার হওয়ার সেতু। পিঠে বাঁধা ঝোলা; কোনও মায়ের পিঠে বাঁধা সন্তান। একটা দড়ি ধরে আর দুটো দড়িতে পা ফেলে ফেলে তাঁরা পার হচ্ছেন সেই ভয়ঙ্করী নদী—এতটুকু অসাবধান হলে, একবার পা ফস্কালে পড়ে যাবেন সেই উপলসঙ্কুল তীব্র স্রোতে, ঐরাবতও যেখানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তবুও তাঁরা গেছেন। —হিমালয়ের আহ্বান যাঁর কানে এসেছে, যাঁর প্রাণে পৌঁছেছে সে প্রাণারামের ডাক, তিনিই চলেছেন এই দুর্গম বন্ধুর পথে; মৃত্যুভয় তাঁকে বাধা দিতে পারে নি। সকল কষ্টের পরে সকল দুঃখের আঁধার-রাত্রি পেরিয়ে মৃত্যু-ভয়কে জয় করে যখন উত্তীর্ণ হয়েছেন অমৃত-তীর্থে তখন সার্থক হয়েছে তাঁদের যাত্রা, জীবন হয়েছে ধন্য পুণ্যময়। আর, আমরা চলেছি অক্লেশে; শুধু চেয়ে আছি পথের দিকে। কষ্ট নেই, আছে আতঙ্ক। হয়তো এই-ই আমাদের তীর্থের মাশুল। অর্থদণ্ড আর ভয়। পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠছে, কেবলই উঠছে উঁচু থেকে উঁচুতে; কর্কশ অসমতল পথ। কোথাও সাদা পাহাড়, কোথাও ধূসর, কোথাও হলুদ। আবার কোথাও গগনচুম্বী, নিকষ-কালো পাথরে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন যুগান্তরের প্রহরী, কালভৈরবের অনুচর। অদূরেই রজত-গিরিনিভ শঙ্করের ধাম, ধ্যান-সমাহিত ধূর্জটির ধ্যান যেন ভঙ্গ না হয় তারই জন্যে কি প্রহরা দিচ্ছেন এই শিব-অনুচরগণ? গিরিরাজ হিমালয়ের পাষাণবক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়েছিল একটি স্নেহ-নির্ঝরিণী-ধারা, তিনিই তো পার্বতী উমা শিব-সমর্পিতা, শিবগত-প্রাণা। শিবেরই অংশভূতা শিবানী। এই হিমালয়ের কোন্ কন্দরে, কোন্ দুর্গম অরণ্যে তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন অপর্ণা? কোথায় দর্শন দিয়েছিলেন তাঁর চিরপতি মহাদেব? কুমারসম্ভবের সূচনা হয়েছিল কোন গিরিশয্যায়?

অসুর জয় করে শক্তির দম্ভে আর দর্পে, যখন মত্ত হয়ে উঠেছিলেন দেবগণ, তখন যক্ষের রূপ ধারণ করে এই উমা হৈমবতীই আবির্ভূতা হয়েছিলেন তাঁদের সামনে, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে অগ্নি গেলেন তাঁর পরিচয় জানতে; কিন্তু যক্ষই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি, কি তোমার শক্তি'? আমি অগ্নি,

মুহূর্তে সব কিছু দগ্ধ করে দিতে পারি।' 'এই তৃণখণ্ডটি দগ্ধ কর।' সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও অগ্নি ব্যর্থ হলেন, তৃণ দগ্ধ হল না, ফিরে গেলেন নত মস্তকে। তারপরে এলেন পবন। এবারেও সেই প্রশ্ন, 'কে তুমি, কি তোমার শক্তি?' 'মুহূর্তে উড়িয়ে দিতে পাবি বিশ্ব', বায়ুব উত্তর। 'এই তৃণখণ্ডটিকে স্থানচ্যুত কর।'

ব্যর্থ শক্তির লজ্জায় ফিরে গেলেন পবন, তৃণ স্থানচ্যুত হল না। তখন এলেন ইন্দ্র। কোথায় যক্ষ? তাঁর সামনে আবির্ভূতা, কষিত কাঞ্চন-বর্ণা উমা হৈমবতী। পরমা শক্তিব পায়ে লুটিয়ে পড়লেন দেববাজ। বুঝলেন তাঁরই শক্তিতে তাঁরা শক্তিমান, নিখিল বিশ্ব এই ইচ্ছাময়ী শক্তিরই খেলা।

একদিন এই উমাই চণ্ডিকারূপে শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর ভ্রাতৃদ্বয়কে যুদ্ধে বধ কবেছিলেন। গিরিকন্যা মনোহাবিণী উমা একদিন গঙ্গা স্নানে এসেছেন, তাঁর রূপের কথা শুনে মুগ্ধ বিহ্বল হলেন শুম্ভ। দূত পাঠালেন দেবীর কাছে। সমগ্র স্বর্গ ও স্বর্গের ঐশ্বর্য যাঁব করতলগত তাকে পতিত্বের বরণ করুন উমা, দূতেব এই বার্তা শুনে দেবী ঈষৎ হাসলেন। বললেন, 'দূত তোমার প্রভুব কথা শুনলাম, তিনি স্বর্গ মর্ত্য ত্রিলোকের অধীশ্বর, তাঁর ক্ষমতায় আমার এতটুকু অবিশ্বাস নেই। তবে আমি বাল্যকালে বুদ্ধিহীনের মত একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি। তাঁকে গিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে বল, আমাকে যিনি বলে পরাজিত করবেন তাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করব, এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা।' দূত হেসে উঠলেন, 'দেবতারা সমগ্র শক্তি নিয়েও যাঁর সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়লাভ করতে পারলেন না আপনি এক অবলা, কোন্ সাহসে বলের দম্ভ করছেন? সসম্মানে নিয়ে যাই চলুন, কেন বৃথা অপমানিত হয়ে যাবেন? যেতে আপনাকে হবেই।' দেবী প্রতিজ্ঞায় অটল, বললেন, 'তুমি যাও, তোমার প্রভুকে গিয়ে বল আমাব প্রতিজ্ঞার কথা।' দূতের কাছে শুনে ক্ষমতা আর শক্তির দম্ভে অট্টহাস্য করে উঠলেন শুম্ভ, 'একে নারী, তায় অবলা, তারই এত শক্তির আস্ফালন। কেশাকর্ষণ করে নিয়ে এস তাকে।' শুম্ভ সেনাপতি ধূম্রলোচনকে পাঠালেন। ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হল মুহূর্তে, তার অঙ্গের ধূমে ভরে গেল আকাশ। তারপরে আরও কত অসুর-যোদ্ধা একে একে

এই অবলার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন। দেবী একা; কিন্তু তাঁর অঙ্গ থেকেই আবির্ভূতা হলেন চামুণ্ডা; কালী; আবার বিষ্ণুর বৈষ্ণবী, ব্রহ্মার ব্রাহ্মণী, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র সকল দেবতার শক্তিই একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীর সঙ্গে মিলিতা হলেন। প্রচণ্ড সে যুদ্ধে একে একে শক্তিশালী অসুর সৈন্যগণ যখন বিনষ্ট হতে লাগলেন, তখন শুম্ভ এলেন। প্রচণ্ড বেগে প্রবল শক্তিমান শুম্ভ ধাবিত হলেন দেবীর দিকে। গদা; ধনু, খড়্গ সমস্ত অস্ত্র যখন ব্যর্থ হল, তখন পরাজিত-প্রায় শুম্ভ বিদ্রূপ করে বললেন, 'তুমি তো একাকিনী নও, সমস্ত দেব পত্নীর সহায়তায় তুমি যুদ্ধ করছ, এই তো তোমাব দম্ভ, তোমার শক্তির আস্ফালন!' হেসে উঠলেন দুর্গা, "আমার আবার দ্বিতীয় কেউ আছে না কি—'দ্বিতীয়া কা সমাপরা'? আমি যে অদ্বিতীয়া, ওরে মূর্খ, তুমি কি তা জান না?" মুহূর্তে সমস্ত মাতৃশক্তি দেবীর অঙ্গে লীন হয়ে গেলেন, একা দেবী দাঁড়িয়ে রইলেন শুম্ভের সামনে। শুম্ভ-নিশুম্ভরূপী অধ্রুব অ-শিবকে দেবী নিজের হাতেই নিধন করলেন, মুক্ত হল স্বর্গলোক, দেবগণ ফিরে ফিরে গেলেন নিজ নিজ অধিকারে।

কোথায় সে স্বর্গপুরী অলকা, অলকানন্দা বয়ে এনেছেন কি সেই অলকার বার্তা? আমরা চলেছি ফুলের উপত্যকার ধার দিয়ে, একটা সাইনবোর্ডে লেখা, 'Valley of flowers'—পুষ্পময়ী উপত্যকা। নানা বর্ণের ফুলে ফুলে এক একটি শৃঙ্গ আবৃত হয়ে আছে, নেমে ভেতরে গেলে না কি দেখা যেত ফুলের সমারোহ, স্বর্গের নন্দনকাননের মতই না কি তার শোভা আর সৌন্দর্য। আমরা শুধু দৃষ্টি দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি। অনুভব করবার সময় আমাদের কোথায়? ক্রিসান্থিমাম, গোলাপ, কর্ণ-ফ্লাওয়ার আরও কত যে জানা-অজানা ফুল ফুটে আছে পথের ধারে ধারে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে। ডালিম ধরে আছে গাছে গাছে। মুরগীর ঝুঁটির মত এক-একটি গাছে ফুটে আছে ঝরকে ঝরকে লাল ফুল। এগুলো না কি রামদানার গাছ। ভুট্টার মতই পাহাড়ী অধিবাসীদের খাদ্য।

হনুমানচটি

এখানে এসে কিছুক্ষণের জন্য বাস থামল, এর পরে আরও খাড়া চড়াই, রাস্তাও না কি অনেক খারাপ। বাস ছাড়ল। আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলাম, রাস্তার ভয়াবহতা যতই বাড়তে লাগল ততই উচ্চস্বরে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে লাগলেন, 'জলি' পার্টির সহযাত্রিণীগণ; ওঁদের ভক্তি আছে, আছে বিশ্বাস আর মনোবল; আমার তো তা নেই। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি প্রবলবেগে, প্রচণ্ড গর্জনে শতধারায় নেমে আসছে এক ঝর্ণা; সমস্ত পথ প্লাবিত করে চলছে নিচের দিকে, ধাক্কায় ধাক্কায় বিরাট বিরাট পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে পথে। আর্তরব উঠল যাত্রীদের কণ্ঠ থেকে, 'প্রভু বদরিনারায়ণ; রক্ষা কর। পার করে দাও তোমার এই দুর্গম ভয়ঙ্কর পথ', ড্রাইভার নীরবে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন এতক্ষণ। বাঁকগুলি ঘুরবার সময় আমরা আতঙ্কে শিহরিত হচ্ছি। যদিই বা হঠাৎ ভুলক্রমে একটা ফিরতি জিপ বা বাস এসে পড়ে তবে কি হবে? হর্ণ দিচ্ছেন না কেন? হঠাৎ এসেও পড়ল এক জিপ; অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা আর সতর্কতার সঙ্গে ব্রেক কষলেন ড্রাইভার, প্রবল ঝাকুনি দিয়ে গাড়িটা আচমকা থেমে গেল। কী নিপুণ সুদক্ষ হাতে গাড়ি চালাচ্ছেন ড্রাইভার! কিন্তু আমরা যে ভয়ে মরি। কিছু তাঁকে বলারও উপায় নেই, গাড়ির ভেতরে সাইনবোর্ডে হিন্দীতে লেখা আছে, গাড়ি চলা কালে কেউ যেন ড্রাইভারের সঙ্গে কথা না বলে। ড্রাইভার যদি একটু অন্যমনস্ক হন তবে যাত্রীসহ গাড়ির লীলা সম্বরণ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। এবার ড্রাইভারই আমাদের নামতে বললেন। আমরা বেঁচে গেলাম। ধীরে সাবধানে সেই ভীষণ প্রবাহ পার হয়ে যখন নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন অতিকষ্টে সেই সঙ্কট পার হয়ে এলেন ড্রাইভার। আমরা আবার গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু কতক্ষণ? উৎকণ্ঠ, উৎকর্ণ আমাদের সামনে আসছে একটার পর একটা ভয়।

অলকানন্দা কোথাও অনেক নিচে সগর্জনে বয়ে চলেছেন মর্ত্যভূমির দিকে। কয়েক বৎসর আগে এঁরই বন্যায় এই হিমালয়ে ভেসে গিয়েছিল কত বাস, প্রাণও ধ্বংস হয়েছিল অনেক।

আমাদের যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে। বেলা বারোটা—দূরে দেখা যাচ্ছে বদরি-বিশালাজীর মন্দিরশীর্ষ। যুক্তকরে মাথা নত করে যাত্রীরা বদরিনাথজীর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। আমি এক মেঘাবৃত শৃঙ্গ দেখে ভাবলাম, ঐ বুঝি বদরিনারায়ণজীর মন্দির। মাথা নত করে প্রণাম জানালাম, বুক ভরে উঠল অনির্বচনীয় সুধা রসে, দুই চোখ ভরে উঠল অশ্রুধারায়। চিরজীবনের স্বপ্ন সফল হল আজ, ঠাকুর আমাকেও তুমি টেনে আনলে তোমার দ্বারপ্রান্তে। শুনেছি ইষ্ট মূর্তিতে তুমি ভক্তদের দর্শন দাও। আমাকেও কৃপা কর প্রভু।

বাস থেকে নামলাম। আকাশ ছেয়ে আছে ঘন মেঘে, কুয়াশাব চাদরে ঢাকা চারিদিকের পাহাড়, মাঝখানে উপত্যকা। অলকানন্দা এখন প্রায় আমাদের নাগালের মধ্যে, তার উপরে সেতু, তারই অপর পারে বদরিজীর মন্দির। আমরা আছি এপারে।

এতক্ষণে কুয়াশা আর মেঘের ফাঁক দিয়ে আমি মন্দিরের উজ্জ্বল স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া দেখতে পেলাম।

এতদিনের এত আকুল কামনার আজ অবসান! ভক্তি নেই, নেই সাধনা, নেই কোনও দুঃখবরণ, তবু আজ এসে পৌঁছলাম তাঁর দরজায়।

পাণ্ডা, ছড়িদার সবাই এগিয়ে এলেন, মালপত্র পড়ে রইল বাসের ছাদে, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন ম্যানেজার। সুন্দর এক দোতলা দালানে গিয়ে উঠলাম, সুবিখ্যাত মোহনানন্দ মহারাজের আশ্রমে। তাঁর এক সন্ন্যাসী শিষ্য এখানে থাকেন, আর কয়েকজন ভক্ত ব্রহ্মচারী। বলাইবাবু (এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার) আগের দিন এসে এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কুণ্ডু স্পেশ্যাল যাত্রী নিয়ে বছরে কয়েকবার আসেন। তাই তাঁদের সঙ্গে এদিককার সব চটি, ধর্মশালা ও আশ্রম কর্তৃপক্ষের যথেষ্টই জানাশোনা। এঁদের কাছ থেকে সবরকম সুবিধাই ওঁরা পেয়ে থাকেন। স্বর্গধামও আজ আধুনিক যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে হার মেনেছে। এই বারো হাজার ফিট উঁচু (সমুদ্রবক্ষ থেকে বদরিশৃঙ্গ তেইশ হাজার ফিট উঁচু) পর্বতের উপত্যকায়ও গড়ে উঠেছে ছোট-খাট আধুনিক শহর। 'হোটেল দেবলোক', 'বিরলা ধর্মশালা', 'স্বর্গধাম', প্রভৃতি আধুনিক যাত্রীনিবাস গড়ে উঠেছে

চারদিকে। বিজলী আলো ঘরে ঘরে। শ্রান্ত-ক্লান্ত আমরা দোতলায় আশ্রয় পেলাম। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর, লাগোয়া ভালো স্নানঘর, দেখে স্বস্তি পেলাম, কিন্তু শান্তি পেলাম না। দুর্গম দুরধিগম্য হিমালয় এতটা সহজলভ্য আর আরামপ্রদ না হলেই কি চলত না।

হাত পা মেলে সবাই বসে পড়েছেন, দূরে দেখা যাচ্ছে একের পর এক যাত্রীবাহী বাস এসে থামছে, যাত্রীরা নামছেন, হাঁটা-পথেও এসেছেন হয়তো কেউ কেউ। চারিদিকেই তীর্থযাত্রীর মেলা। অদূরে অলকানন্দা সগর্জনে বয়ে চলেছেন। একটু নামলেই তাঁকে স্পর্শ করা যাবে। বিরাট বিরাট পাষাণের ভার বক্ষে নিয়ে অবিরাম বয়ে চলেছেন ঊর্ধ্বলোকের উৎসমুখ থেকে নিম্নে সাগর-সঙ্গমে। জাহ্নবীর সঙ্গে মিলিতা হয়ে চলেছেন মর্ত্যের কলুষিত মানুষের মালিন্য ঘোচাতে।

অলকানন্দার উপরে সেতু দেখা যাচ্ছে, তার ওপারে মন্দির।

আর বসে থাকতে পারলাম না, একলাই বেরিয়ে পড়লাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে। মন্দিরের চূড়া যখন দেখতে পাচ্ছি তখন অচেনা হলেও পথও দেখতে পাব নিশ্চয়ই। পাথর বিছানো অসমতল পথ বেয়ে নিচে নামলাম, সেতু পার হয়ে গেলাম মন্দিরের প্রবেশদ্বারে। এখন মন্দির বন্ধ, সন্ধ্যায় দরজা খুলবে, তখন হবে দর্শন। ছোট পাথরের মন্দির, ছোট তার বারান্দা। সেখানেই মাথা ঠেকালাম। দেব-দর্শন না-ই বা হল, স্পর্শ করলাম তাঁর মন্দিরের পাদপীঠ। পড়ে-থাকা এক দানা ছোলার ডাল-প্রসাদ তুলে নিলাম হাতে। এক সেবক সেখান থেকেই কুড়িয়ে এক টুকরো শুকনো নারকেল-প্রসাদ দিলেন। মাথায় ঠেকিয়ে মুখে তুললাম। 'হে নারায়ণ, তুমি প্রসন্ন হও। তোমার প্রসন্নতাই তো পরম প্রসাদ। সেই প্রসাদই ভিক্ষা চাই তোমার কাছে।' আজ আমার বহুদিনের সাধনার সার্থকতা। না সাধনা নয়, শুধুমাত্র কল্পনা, স্বপ্ন আর সৌখীন বাসনা। কোথায় সে মরণ-কষ্টের পরে 'জীবন' দর্শন? কোথায় মৃত্যুর দুয়ার হতে অমৃতে উত্তরণ?

দীর্ঘ কষ্টের পথ অতিক্রম করে সমস্ত ভয়কে জয় করে যাঁরা আসতেন তোমার দরজায় তাঁদের সে দুঃসহ দুঃখই এনে দিত চরম সার্থকতা, ভয়কে জয়

করেই তাঁরা পেতেন অভয়। তাঁদের সে সুতীব্র আকুলতার মূল্য তাঁরা লাভ করতেন, তাঁরাই পেতেন পূর্ণ দর্শন।

ফিরে চলেছি আস্তানায়, দেখি একজন অবাঙালী মহিলা একটি কুণ্ডের থেকে স্নান করে উঠলেন। কাছে যেতেই বাঁধানো কুণ্ডের দিকে চেয়ে স্নানের জন্যে মন লোভাতুর হয়ে উঠল। বরফের রাজ্যে এসেছি, পাহাড়ের চূড়াগুলি ঢেকে আছে ঘন কুয়াশা আর মেঘে; শীতও যথেষ্টই টের পাচ্ছি। পাহাড়ের ঝর্ণার জল বরফগলা, হাত দিলে জমে যায়; অথচ কি অদ্ভুত, কুণ্ডের থেকে ধোঁয়া উঠছে, কুণ্ডে ফুটন্ত গরম জল! কুণ্ডের বাঁধানো পাড়ে পা দিতেই পায়ে গরম লাগল। কী অপূর্ব ব্যবস্থা করুণাময় ভগবানের! দীর্ঘ দুঃখের পথ, তুষরাবৃত ভীষণ পথ পার হয়ে ভগ্ন অর্ধপ্রাণ পদযাত্রীরা যখন এখানে এসে পৌছাতেন, তখন তাঁদের সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণা আর কষ্টেব অবসান হত এই তপ্তকুণ্ডে স্নান করে, তাঁবা আবার পূর্ণ জীবনের সাড়া পেতেন অনুভব করতেন পূর্ণ প্রাণের উষ্ণতা। গায়ে কিছু জামা-কাপড বেশিই ছিল, দুপুরবেলা মন্দির বন্ধ, যাত্রী পাণ্ডা কেউ ধারে কাছে নেই, শুধু ঐ স্নাত মহিলাটিই রয়েছেন সামনে। লজ্জা আমরা পথেই বিসর্জন দিয়ে এসেছি বিরাটেব সামনে এলে বোধ হয় তাই-ই হয়। বাঁধানো কুণ্ডের প্রথম ধাপে বসলাম। জল ভীষণ গরম। পাহাড়ের গা বেয়ে আসছে এই উষ্ণ জলধারা। নলের সাহায্যে তিন চারটি কুণ্ডে ঐ জল ধরা হচ্ছে। আবার বের করে দেবারও ব্যবস্থা আছে। পুরুষদের কুণ্ড একদিকে, মেয়েদের আর একদিকে। কুণ্ডের ধারে মেয়েদের কাপড় ছাড়বার জন্যে দেয়াল-দেওয়া ঘবও আছে একটা। জল মাথায় ছুঁইয়ে পা ডোবালাম, ওরে বাবা, সাধ্য কি স্নান করার, পা পুড়ে যাচ্ছে এক একবার পা ডোবাই আবার তক্ষুণি তুলে ফেলতে হয়। প্রায় পাঁচ সাত মিনিটে সয়ে এল অনেকটা, ঝুপ করে নেমে দাঁড়ালাম কোমর জলে। প্রথমটা কষ্ট; কিন্তু একটু পরেই গরমে শরীর যেন 'জুড়িয়ে' গেল। বাসের ঝাঁকুনীর ব্যথা, মাথার কষ্ট, শরীরের সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যাচ্ছে। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। ডুবও দিলাম দুই-চারটা। ঝরঝরে দেহ নিয়ে তারপরে উঠে এলাম পাড়ে। মোহনানন্দজীর আশ্রমে ফিরে গিয়ে যখন ভিজে জামা মেলে দিচ্ছি, সবাই

অবাক। 'এ কী স্নান করে এলেন কোত্থেকে?' সগর্বে আমার সাহসিক অভিযানের কথা যখন বললাম, সবাই বললেন—'ধন্যি মহিলা বাবা আপনি, কেমন একলা একলা মন্দির দর্শন করে এলেন, স্নানও সারা হয়ে গেল তপ্তকুণ্ডে!' হেসে বললাম, 'একলা চলরে'। বেশ শীত করছে বাইরে বিরাট এক উনুনে, ততধিক বিরাট এক ডেকচিতে গরমজল বসিয়ে দিয়েছে কুণ্ডুর পরিচারকরা—চা এল, এল পর্যাপ্ত জলখাবার। গরম চা খেয়েও শীত কমল না। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি আমরা। হঠাৎ 'মাসীদি' বলে উঠলেন, 'ওমা সৌমিত্র চ্যাটার্জী এসেছেন দেখছি, হিমালয়ে ওঁদের স্যুটিং আছে নাকি?' 'কই কই কোথায়'? বদরিনাথের চেয়ে সুখ্যাত চিত্রাভিনেতা সৌমিত্রও কম দর্শনীয় তো নন! 'ঐ যে হাত পা নেড়ে কথা বলছেন, দেখুন না চেয়ে ঐ বাগানে।'

স্যুট-বুট-নেকটাই-পরা আমাদের এ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার বলাইবাবু দেখি বাগানে দাঁড়িয়ে। এই কয় দিন দেখেছি তাঁর ধুতি পরা দীনহীন চেহারা, আজ হঠাৎ তাঁর সৌমিত্র চ্যাটার্জীতে রূপান্তর। বেচারা দূরে দাঁড়িয়ে, বুঝতেও পারলেন না যে তাঁকে নিয়েই হাস্যমুখর হয়ে উঠেছেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের যাত্রীদল।

বিকাল শেষ হয়ে আসছে—সন্ধ্যায় মন্দির খোলা হবে, আমরা যাব বদরি-বিশালা দর্শনে।

বাইরে, আমাদের চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এই উপত্যকা। আমাদের বামে নরপর্বত, দক্ষিণে নারায়ণ-পর্বত, নারায়ণ-পর্বতেই বদরিজীর মন্দির। নর-পর্বতের পশ্চাতে যে শৃঙ্গরাজী দেখা যাচ্ছে তারই মাঝে আছে গন্ধমাদন, যে গন্ধমাদন রামায়ণে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

রাবণের শক্তি শেল-বিদ্ধ লক্ষ্মণ মূর্ছিত মৃতপ্রায়, ভাইএর শোকে শ্রীরামচন্দ্র অচেতন। দিশাহারা সুগ্রীব, বানর-সৈন্যগণ স্তব্ধ-বিহ্বল। জাম্ববান ডাকলেন—'হনুমান, এখন তুমিই ভরসা, মহাবীর, একমাত্র তুমিই পার লক্ষ্মণকে বাঁচাতে। হিমগিরিতে আছে গন্ধমাদন পর্বত, তাতে আছে বিশল্যকরণী আর মৃতসঞ্জীবনীর গাছ; যাও নিয়ে এস আজ রাত্রির মধ্যেই। ঐ অমৃতময় ঔষধের গন্ধেই বেঁচে উঠবেন লক্ষ্মণ'। 'জয় রাম' বলে এক লম্ফে আকাশে উঠলেন মহাভক্ত মহাবীর। জাম্ববানের নির্দেশিত পথে বেশিক্ষণ লাগল না, নামলেন

গন্ধমাদন শিখরে। কিন্তু কোন্‌টি সেই মহৌষধি, কে বলে দেবে সন্ধান? চিন্তিত হলেন হনুমান, কিন্তু সময় নষ্ট করা যে চলে না। রাত্রি প্রভাত হয়ে গেলে আর তো ফল হবে না ওষুধে।

'জয় রাম', 'জয় প্রভু', 'শক্তি দাও'। শিখরে দিলেন টান, মড় মড় করে উঠে এল মূলসহ গন্ধমাদন পর্বত, কাঁধে বহন করে চলে এলেন লঙ্কায়। প্রাণসমুজ্জ্বল—সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ওষুধের গন্ধেই চোখ মেলে চাইলেন লক্ষ্মণ, শ্রীরামের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বানর-সৈন্যবাহিনী হল কলমুখর।

হনুমান আবার সেই বিশাল পর্বত কাঁধে নিলেন, যথাস্থানে রেখে এলেন কি না তিনিই জানেন, মহাবীর হলেও তাঁদের 'জাতীয় বৈশিষ্ট্য' গাত্র কণ্ডুয়নের স্পৃহা যখন ক্ষণে ক্ষণেই বেড়ে উঠছিল তখন কি 'ধুত্তোর' বলে পাহাড়টাকে ঘাড় থেকে ফেলে দেন নি অস্থানে?

তা না হলে এত কাছে গন্ধমাদনকে আমরা কেমন করে দেখলাম? শুনেছি তো দুর্গম দুরারোহ ঐ উচ্চ পর্বতে পাণ্ডবরাই উঠতে পারেন নি। এমন যে শক্তিশালী ভীমকর্মা ভীম, তাঁকেও এই পর্বতারোহণ করতে নাজেহাল হতে হয়েছিল, শেষে হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ এসে কাঁধে করে ওঁদের উত্তীর্ণ করে দিলেন। নরনারায়ণ পর্বতের মাঝখানে তেইশ হাজার ফিট উঁচু নীলকণ্ঠ পর্বত। ম্যানেজার বললেন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে যাঁরা আসেন তাঁরাই ঐ অপূর্ব পর্বতশৃঙ্গের নানা বর্ণবৈচিত্র্য দেখতে পান। মেঘমুক্ত আকাশে শুভ্র তুষারাবৃত এই শৃঙ্গকে ঠিক মহাদেবের মতই মনে হয়। সূর্যোদয়ের সময়ে এ শৃঙ্গে সাতরঙের সমারোহ আর শোভা দেখা যায়।

আজ ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হচ্ছে, আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা, কুয়াশার ঘন আস্তরণে শৃঙ্গগুলিও ঢাকা। আমাদের ভাগ্যে নীলকণ্ঠ দর্শন হল না। মন খারাপ হয়ে রইল। সন্ধ্যা সমাগত, আমরা সদলবলে মন্দিরের দিকে চললাম। এই সামান্য পথের চড়াই-উৎরাইটুকু পার হতেও কষ্ট হল। কিরণদির একটি পা ব্যাধিগ্রস্ত, সেই থুথুরে বুড়ীমার ভাঙা কোমর, কুব্জ দেহ, ন্যুব্জ দেহ বুড়ীও আছেন আরও দুই-চারজন, লাঠি ধরে ধরে ঠুক্‌ঠুক্ করে এঁরাও চলেছেন, সকলের চোখেই পরম প্রত্যাশা, হৃদয়ে পরম লগ্নের প্রতীক্ষা।

অলকানন্দার পুল পার হয়ে এলাম মন্দিরচত্বরে জুতো খুলে রাখার ব্যবস্থা আছে নিচে একটা ঘরে। পাথরের কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই বুক ধড়ফড করে। কিরণদি আর বুড়ীমাকে ধীরে ধীরে তুলছে সুধীর ও অন্যান্য ভৃত্যরা। সিঁড়ির পরে প্রবেশদ্বার—এখানে গরুড়মূর্তি প্রতিষ্ঠিত—তাঁকে প্রণাম না করে নারায়ণের কাছে যাবার অধিকার কারও নেই। কিছু দক্ষিণা দেওয়াই বিধি, দিলেনও সবাই।

মন্দিরের দরজায় এলাম, এখনও দরজা খোলা হয় নি। পাশে লক্ষ্মীদেবীর আর একটি ছোট মন্দির—তার সঙ্গেই আর একটি ঘর। সে ঘরে শঙ্করাচার্যের একটি সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, শঙ্করাচার্যসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীও এখানে কয়েকজন আছেন, তাঁরাই সম্ভবতঃ এই মূর্তির সেবা-পূজা করেন। আর আছেন বদরি-বিশালার প্রতিভূ ছোট একটি নারায়ণমূর্তি, কালীপূজার পরে যখন বদরিনাথের মন্দির বন্ধ হয়ে যায়—বরফ পড়া শুরু হয়, তখন এই প্রতিভূ মূর্তিকেই যোশী মঠে নিয়ে যাওয়া হয়। পূজারী, পাণ্ডা, দোকানী সবাই নেমে যান নিচে তাঁদের ছয় মাস নিচেই থাকতে হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণ, দোকান, গৃহ সমস্তই বরফে ঢেকে যায়। এখানে চারটি তাম্রপাতে (এক-একটার ওজন আধমনের কম হবে না। ঠিক কালো পাথরের মতই দেখতে) সম্ভবতঃ ব্রাহ্মী বা মাগধী লিপিতে অনেক কিছু লেখা রয়েছে—সন্ন্যাসী বললেন এ লেখা পাণ্ডবদের। কি লেখা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, আজ পর্যন্ত এর পাঠোদ্ধার হয় নি।

পরম শ্রদ্ধেয় সুনীতি চাটুয্যে-মশাই নিশ্চয়ই এখানে কোনও দিন আসেন নি—নইলে এতদিনেও কি জানা যেত না, কি লিখে রেখে গেছেন পাণ্ডবেরা? কুণ্ডুদের নির্বাচিত পাণ্ডার নাম শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্ট। তিনি বাঙালী, কিন্তু দীর্ঘকাল এদেশে বাস করতে করতে তাঁর ভাষা, আচার-ব্যবহার অনেকটাই এ দেশীয়দের মতই হয়ে গেছে, বাংলা কথাতে যথেষ্ট হিন্দীটান। আর তাঁর ছেলেকে তো বাঙালী বলে চেনাই যায় না। ছেলের কথা শুনে বলি, 'একি তুমি যে একেবারে গাড়োয়ালি বনে গেলে-বাংলা বলতে পার না?' সে খুব গম্ভীর মুখ করে বললে—'কেন হামি তো আপনাদের সঙ্গে বাংলাই বলতে আছি'।

পাণ্ডা ধীরেন ভট্ট মশাই-ই আমাদের তীর্থকৃত্য করাবেন। তিনি আমাদের শঙ্করাচার্যের মূর্তির সামনে পাতা কম্বলে বসতে বললেন। আমরা বসলাম উন্মুখ প্রতীক্ষা নিয়ে। নীলুদি, মঞ্জুদি'রা আস্তে আস্তে গান গাইছেন, কিরণদি ধীর কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করছেন, অমিয়াদি মৃদুস্বরে করছেন প্রার্থনা। বুড়ীমা বসে আছেন যুক্ত করে, নিমীলিত নেত্রে। ডানকুনির দিদিরা, বর্ধমান, মানভূমের দল সকলেই বসে আছেন নম্র নীরবতায়। আমিও ধীরে ধীরে আমার প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করলাম, সুরের অঞ্জলি ঢেলে দিলাম তাঁর পায়ে, হিমালয় অনন্ত উদার, তাঁর উদাত্ত আহ্বান যেন ঊর্ধ্বলোকের ইশারা বয়ে আনছে। অদ্বৈত জ্ঞানের ভূমি, পুণ্য ভারতের আত্মদ্রষ্টা ঋষি-মুনি-অধ্যুষিত এই হিমালয়। এখান থেকেই একদিন মর্ত্যের মৃত্যুশীল মানুষকে ডাক দিয়ে ছিলেন ঋষি—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা,
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥
… …
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

'হে বিশ্ববাসী শোন, তোমরা অমৃতের সন্তান, দিব্যধামবাসী আমি জানিয়াছি তাঁরে, আঁধারের পরপারে জ্যোতির্ময় তিনি। তাঁহারে জানিলে পরে মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার অন্য পথ নাহি।'

আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল, দরজা খুলল, জ্বলে উঠল দীপাধারে শত শত দীপ। ত্বরিত ক্ষিপ্র পদক্ষেপে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম মন্দিরের দরজায়, অপরিসর গর্ভগৃহের পরে অপরিসর কক্ষ, তারই সংলগ্ন ছোট বারন্দা, নানা দেশ থেকে আসা শত শত যাত্রীতে ঘর ভরে গেল, বারান্দায় দাঁড়াবারও জায়গা নেই। অতি কষ্টে অনেক ধাক্কা খেয়ে যখন দরজার সামনে দাঁড়ালাম তখন সেই ক্ষণিক অবসরে প্রথমে কিছুই যেন দেখতে পেলাম না। হৃদয়ে আকুলতা, মনে ভয়—শুনেছি কামনা-কলুষিত অন্তরে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না।

শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে তাঁর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালে তিনি ভক্তকে তাঁর ইষ্টরূপে দর্শন দেন, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে কে যেন দেখেছিলেন কুমড়োর ডগা তাঁর বাড়ির মাচায় লকলক করে বেয়ে উঠছে। সেই ভয়ে আমি কুমিল্লা থেকে রওনা হবার সময়েই আমার লাগানো কুমড়োর গাছটাকে সমূলে উচ্ছেদ করেই গিয়েছিলাম।

কিন্তু এখন তো কিছুই দেখলাম না। তবে কি দর্শন আমি পাবো না? ধাক্কায় ধাক্কায় দাঁড়াতেও পারছি না, 'হে নাথ, হে প্রভু। আমি জানি তোমার কৃপার যোগ্য আমি নই, কিন্তু তুমি তো পরমদয়াল। আমার দীর্ঘলালিত স্বপ্ন কি সফল করবে না ঠাকুর? ধীরে যেন তিমিরাবরণ অপসারিত হল, হীরা-মণি-রত্নে খচিত, ফুলে অলঙ্কারে সজ্জিত আবৃত অঙ্গ, চতুর্ভুজের ঊর্ধ্ব দুই ভুজ দেখা গেল না। শুধু মুখ দর্শন হল। অনেকটাই জগন্নাথের মত। পাঁচ সাত মিনিটের মত দাঁড়িয়েছিলাম, তারপরেই পাণ্ডার ধমকানি, যাত্রীর দম বন্ধ ভীড়ে আর ঠেলাঠেলিতে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলাম, বারান্দাও এত ছোট যে সেখানেও ঠাঁই নেই। তার উপরে দ্বাররক্ষীর কড়াকড়ি, 'দর্শন হয়েছে, এখন সরে যাও' বলতে বলতেই প্রায় ঠেলা দিয়েই সরিয়ে দিল। ঐটুকুর মধ্যে দর্শন কি হল বুঝতেই পারলাম না। একবার জগন্নাথ, তারপরে যেন কালীমূর্তি, তারপরে অনেকটা কৃষ্ণের মত।

বদরিজীর বামপাশে লক্ষ্মীদেবী আর নর-নারায়ণ অবতারদ্বয়ের দুইটি প্রায় একই রকম সুন্দর মূর্তি। ডান পাশে মহাভক্ত কৃষ্ণগত-প্রাণ উদ্ধব। তারপরে নারায়ণের ভাণ্ডারী কুবের, তাঁর পাশে সিদ্ধিদাতা গণেশ, বেদীতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বদরিনারায়ণ, তাঁর পাদপীঠতলে ডানদিকে আসীন তাঁর ভক্ত, বাহন গরুড়, আর বামপাশে হরি গুণগানরত বীণাধারী দেবর্ষি নারদ, বদরি-বিশালার সম্বন্ধে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীটি এই—

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর ষোলটি কন্যাকে ধর্মের সঙ্গে বিবাহ দেন। শ্রীমতী 'মূর্তি' তাঁদের অন্যতমা। তাঁর দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—তাঁরাই ভগবানের অবতার 'নর-নারায়ণ', দুই ভাইয়ে নিবিড় ভালবাসা, একজনকে ছাড়া আর একজন যেন অপূর্ণ। দুই ভাই মায়ের সেবায় প্রাণ ঢেলে দিলেন।

মা তো জানেন না ভগবান স্বয়ং দুই অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর ঘরে। বাৎসল্যে অভিষিক্তা জননী পুত্রদের সেবায়, সন্তুষ্ট হয়ে একদিন ডেকে বললেন, 'বাছা তোমাদের এত ভক্তি আমার প্রতি, এত সেবা করেছ আমার। বল তো বাবা, কি বর চাও আমার কাছে? তোমরা যা চাইবে তাই আমি দেব।' দুই ছেলে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'মাগো তুমি খুশী হয়েছো আমাদের উপর? তবে যা চাই তাই দেবে তো মা?'

'হ্যাঁ বাবা, তোমাদের অদেয় আমার কিছুই নেই, বল কি চাই।'

'মাগো, আমরা বনে গিয়ে শুধু তপস্যা করতে চাই, তুমি প্রসন্ন হয়ে এই বর দাও যেন তপস্যাতেই আমরা মগ্ন হয়ে থাকতে পারি।'

মা চমকে উঠলেন, এ কি সর্বনাশা বর-প্রার্থনা। দুইটি পুত্র, দুইটি কুসুম-সুকুমারতনু বালক, এরা ঘর ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে চলে যাবে গহন অরণ্যে, করবে কঠোর তপস্যা? কিন্তু বাক্য যে দিয়ে ফেলেছেন, এখন তো তিনি নিরুপায়। আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথাতুরা জননী অশ্রুসজল কণ্ঠে অনুমতি দিলেন, 'যাও বাবা, তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তোমাদের তপস্যা জয়যুক্ত হোক।'

গভীর অরণ্যের গহন অন্ধকারে হারিয়ে গেল দুই পুত্র, স্তব্ধ শোকাতুরা জননী দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বারপ্রান্তে।

দুই ভাই হিমালয়ের অলকানন্দার তটে বদরি বনে গিয়ে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হলেন। দীর্ঘদিন, দীর্ঘকাল কেটে গেল, সেই একই আসনে তপস্যারত দুই ভাই। কৃচ্ছ্র কঠোর সে গভীর সাধনার বার্তা গিয়ে পৌঁছাল অলকার ইন্দ্রপুরীতে। ইন্দ্রত্ব বুঝি যায়, ইন্দ্র ব্যাকুল হলেন, ভীত হলেন। নর ও নারায়ণের সুকঠোর তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতি স্বর্গের অপ্সরাদের পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের কাছে।

ব্যর্থ হল ইন্দ্রের চেষ্টা, ব্যর্থ হল স্বর্গের অপ্সরাদের হাস্য, লাস্য, কৌতুক, ছলা, কলা। নর ও নারায়ণের ধ্যান ভঙ্গ হল না।

কয়েক বৎসর কেটে গেল, কৃপা করে নারায়ণ একদিন চোখ মেলে চাইলেন, তাঁর দৃষ্টি প্রসন্ন, কিন্তু অপ্সরাগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন, 'কার তপস্যা নষ্ট

করতে এসেছি আমরা, ইনি যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ!' প্রসন্ন-মধুর হাস্যে নারায়ণ এই দেব নর্তকীদের আশ্বাস দিলেন, দিলেন অভয়।

তাঁদের সামনেই নিজের উরু থেকে দিব্যাঙ্গনা, অপরূপা উর্বশীকে সৃষ্টি করলেন, উর্বশীকে দেখে রম্ভা, মেনকা, ঘৃতাচী প্রভৃতি স্বর্গের অপ্সরাগণের রূপের অহঙ্কার ম্লান হয়ে গেল, লজ্জায় তাঁরা মুখ নত করলেন। উর্বশীকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করে নারায়ণ বললেন, 'যাও এই সুন্দরী রমণীকে নিয়ে তোমাদের প্রভু ইন্দ্রকে উপহার দিও।'

আজও বদরিকাক্ষেত্রে উর্বশীকুণ্ড সেই পুরাতন কাহিনীর কথা দর্শনার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। নর ও নারায়ণ তিন যুগ ধরে তপস্যায় মগ্ন হয়ে রইলেন। দ্বাপরের শেষে, কলির প্রারম্ভ সময়ে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ রূপে আর নর অর্জুন রূপে ভারতে অবতীর্ণ হলেন।

তাঁর অবতরণের প্রাক্কালে হিমালয়ের ঋষিরা কাতর হয়ে প্রার্থনা জানালেন, 'প্রভু মর্তভূমিতে অবতরণ করবে তুমি, কিন্তু আমরা যে তোমার অদর্শন সইতে পারব না। তুমি এক রূপেও এখানে অবস্থান কর। এই আমাদের প্রার্থনা।'

ভগবান বললেন, 'এখন কলিযুগ আগত-প্রায়, এযুগে আমার সাক্ষাৎ দর্শন অসম্ভব; নারদকুণ্ডে আমার মূর্তি আছে, তাই এনে তোমরা প্রতিষ্ঠা কর, আমার ঐ মূর্তির পূজা করলেই কলির লোকের মোক্ষলাভ হবে'। শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল, দেবর্ষি নারদ পূজারী নিযুক্ত হলেন।

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ভক্তগণ বুদ্ধরূপে এই নারায়ণকে পূজা করতে লাগলেন (বদরিনারায়ণকে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মতই মনে হয়)। পরে শ্রীশঙ্করাচার্যের অভ্যুত্থানে যখন বৌদ্ধ প্রভাব-মুক্ত সনাতন ধর্ম পুনরায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন বৌদ্ধগণ মন্দিরটি ধ্বংস করে, শ্রীমূর্তিকে নারদকুণ্ডে নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। কৌপীনধারী, নিঃসম্বল সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য এই দুর্গম দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে কেমন করে মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন সে এক বিস্ময়। ভারতের চারিপ্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করলেন অদ্বৈত জ্ঞানের সাধক শিবাবতার শঙ্করাচার্য। যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের

উপাসক, যিনি নির্গুণ, নিরুপাধিক, নিরাকার ব্রহ্মের সাধক, তিনিই বদরিজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন নব-নির্মিত মন্দিরে। বদরিনাথধামে এসে তিনি যখন দেখলেন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত, মূর্তি অন্তর্হিত, তখন অসীম ব্যথার ভার বক্ষে নিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানে নারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, 'নারদকুণ্ডে আমার কয়েকটি বিগ্রহ আছে, সেই কুণ্ডে ডুব দিয়ে যে বিগ্রহ হাতে পাবে তাকেই এনে তুমি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর।'

আচার্য শঙ্কর কুণ্ডে ডুব দিলেন, বিগ্রহও পেলেন একটি, কিন্তু সে বিগ্রহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট নয়, মুখও অস্পষ্ট নিরাকারবাদী সন্ন্যাসীরও যেন মন ভরল না। যিনি অরূপ তিনিই তো রূপময়, তাঁর প্রকাশও যে কত সুন্দর, কত মহিমাময়। শঙ্কর আবার ধ্যানে বসলেন 'প্রভু তুমি যখন রূপ গ্রহণ করেছ, তখন মনোহর রূপেই এস, মানুষ তোমার ভুবন-ভোলানো রূপ দেখে পাগল হোক, ছুটে আসুক তোমার পদপ্রান্তে।'

আদেশ হল 'যে মূর্তি পেয়েছ তাঁকেই প্রতিষ্ঠা কর শঙ্কর। শুধু বাইরের রূপে যে ভোলে সে তো আমাকে পায় না। আমিই তো অন্তরতম, ভক্ত আমাকে লাভ করবেন অন্তরে। এই মূর্তি তো শুধুই আমার স্মারক, আমার প্রতীক।' সেই মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করলেন শঙ্করাচার্য, আজও তাঁরই পূজা হচ্ছে।

সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে চলছে, কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন করবার সাধ্য নেই, অধিকারও নেই। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি, ছোট্ট একটি ঘর, সেখানে যদি শত শত লোক হয় তবে উপায় কি? বারান্দায়ও দাঁড়াবার উপায় নেই, দরজায় দাঁড়িয়ে প্রহরী ধমক দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ভিখারীর মত 'দূর দূর' করে। তাই দূরেই সরে আছি দর্শন-সীমানার একেবারে বাইরে। আর সেখান থেকেই দেখবার চেষ্টা করছি।

এখানকার আরতি আমাদের দেশের দেবালয়ের আরতির মত নয়। তিন-চার থাকে ঘেরা দীপাধারে স্তরে-স্তরে সাজানো দীপাবলি জ্বলে উঠল, কী অপূর্ব দৃশ্য! উজ্জ্বল দীপালোকে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলেন বদরিনারায়ণ। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দীপারতি, তারপর কর্পূরারতি আর চামর ব্যজনের পরেই আরতি সমাপ্ত হয়ে গেল। দর্শনার্থীদের কেউ যদি আলাদা টাকা দেন তবে

কয়েকবারই আরতি করা হয়। শেষ আরতির শিখা যখন নিভে গেল শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা অন্ধকার পথ পেরিয়ে অলকানন্দার পুল পার হয়ে, কর্কশ অসমতল পাথরের রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে কোনও মতে এসে আশ্রমে উঠলাম। পথের পাশে পাশে কয়েকটি চা-পুরীর দোকান, ছবি, চুড়ি মালা প্রভৃতি দুই চারটি মনোহারী দোকান, ধর্মশালা, হোটেল, পোষ্টাফিস বাজার, মোটামুটি ছোট খাট একটি শহরের উপযোগী সবই এখানে আছে।

আকাশের মুখ অন্ধকার আমাদের মত অবিশ্বাসী আর ভক্তিবিহীন যাত্রীর নিশ্বাসেই কি কালো হয়ে গেল আকাশ?

মাঝে-মাঝেই বৃষ্টি ঝরছে, এ কি বিষণ্ণ আকাশেরই অশ্রু? আজ বিছানার সব কম্বলগুলিই গায়ে দিতে হল। শুয়ে পড়লে আর উঠতে পারব না তাই বসেই রইলাম।

পাণ্ডা ধীরেন ভট্ট, মাথায় এক বিরাট পাগড়ী, গায়ে বিলম্বিত ওভার কোট, ঘরে এসে বসলেন। তীর্থকৃত্য কি কি করা বিধি তা তিনি জানালেন। কাল আমাদের পূজা আর ভুজ্যদান করতে হবে। একে একে ঘরে ঘরে সকলের নাম-ধাম লিখে নিলেন, কে কিরকম পূজা দেবেন সমস্ত ঠিক করে তিনি যখন প্রস্থান করলেন তখন রাত্রি দশটা বাজে।

আজ এই শীতে আর খেতে ইচ্ছা করছে না। এই তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে বারান্দায় গিয়ে তবু বসতেই হল, খাবার জন্য গরমজল এসেছে আজ, জল মুখে দেওয়া যায় না এত ঠাণ্ডা, দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক্ করছে। দোতালার বারান্দায় পাতা আসনেও বসা শক্ত, নিচ থেকে উঠছে ঠাণ্ডা, বাইরে থেকে আসছে হাড় কাঁপানো কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস। কোনও মতে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে চলে এলাম ঘরে, একেবারে বিছানায়, কম্বলের তলায়।

বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম, একটানা বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। চারিদিক নিস্তব্ধ, আকাশের গায়ে গায়ে নির্বাক অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো শৃঙ্গ। মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া দীপালোকে প্রতিভাত হচ্ছে। এতক্ষণ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে গান ভেসে আসছিল কানে, মাইকে গান করছিলেন এক সাধু, সবাই তাঁকে ডাকে 'বীণামহারাজ', এখন তাঁর

কণ্ঠও নীরব। মর্তলোকের সীমানা ছাড়িয়ে কোথায় এলাম পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি প্রাণী! মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

হে তীর্থদেবতা, তুমি প্রসন্ন হও, দেখাও তোমার প্রসন্ন সুন্দর মুখ। দুঃখের কঠোর পথ উত্তীর্ণ হয়ে আমরা তোমার দরজায় আসি নি, এসেছি ভক্তিবিহীন অহঙ্কারে, তাই কি তুমি রইলে মুখ ফিরিয়ে? তোমার আহ্বান লোকে লোকে বিকীর্ণ করেছ তুমি, আমার দীনতম ঘরেও তো পৌঁছে দিয়েছ সে আহ্বান, নইলে কেমন করে এলাম তোমার দরজায়।

রাত্রি গভীর, ঘুমন্ত সহযাত্রীদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমার চোখে ঘুম নেই, কষ্ট হচ্ছে মাথায়, নিশ্বাসেরও কষ্ট হচ্ছে বুকে। শীতের ভয়ে দরজা-জানালার ফাঁক-ফোকর সমস্ত বন্ধ করে শুয়েছেন আমার সঙ্গিনীরা। কিন্তু আমি তো মরে যাচ্ছি। সন্তর্পণে একটা জানালা একটু ফাঁক করে দিলাম, হু হু করে কন্‌কনে শীতল বাতাস ঢুকল, আমি শান্তি পেলাম।

ঘুম নেই, বার বার শৌচাগারে যেতে হচ্ছে, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, কি করি, এত উঁচুতে অক্সিজেনের অভাব তো কিছু হবেই। শীতও করছে, আবার এক একবার গরমে পা-হাত জ্বালা করে উঠছে, কি যে অস্বস্তি আরম্ভ হল। উঠে বসে রইলাম কতক্ষণ, সারারাত ঘুম এক রকম হলই না। কোথায় এসেছি মর্ত্যলোকের সীমানা ছাড়িয়ে, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। সকলের কথা মনে পড়ে হঠাৎ কেন যে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। বসে বসে ঠাকুরের নাম করতে লাগলাম, ধীরে ধীরে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল।

১২ সেপ্টেম্বর, '৭৩

ভোর হয়েছে, পূর্বাকাশে সূর্যদেব সামান্য একটু দেখা দিয়েই মেঘ আর কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন, আজকের দিনটিও কি মুখ অপ্রসন্ন করেই থাকবে? ঘন মেঘে দিগন্ত আবৃত—নীলকণ্ঠ পর্বতের দর্শন পাব না আজও।

আজ ভূজ্যদান আর পূজা, পাণ্ডা শ্রীবীরেন্দ্র ভট্ট এক একবারে সাত-আট জনকে এক সঙ্গে বসিয়ে তীর্থকৃত্য করাচ্ছেন। তপ্তকুণ্ডে স্নান করে, পূজা দিতে

হয়। আজ দুই তিনটি কুণ্ডের ধারেই খুব ভীড়। 'বাঙালী, মারহাটি, গুজরাটি, বোম্বেওয়ালা—নানা দেশ, নানা জাতির লোক, স্ত্রী-পুরুষের এক বিরাট মেলা। সকলেই এসেছেন একই কামনায়, তীর্থরাজ বদরি-বিশালার দর্শনে জীবনকে সার্থক করতে। কেউ স্তোত্র পাঠ করছেন, কেউ করছেন প্রার্থনা-সঙ্গীত, কেউ বা নীরবে নম্রনত শিরে বসে আছেন পাড়ে। জগতে আনন্দ যজ্ঞে সবারই নিমন্ত্রণ। সবাই এসেছেন সে নিমন্ত্রণে, হিমালয়ের আহ্বানে।

আজও কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে জলে নামলাম। দুই তিন দিন ধরেই একটু একটু জ্বর হচ্ছিল, গরম জলে নেমে কয়েকটা ডুব দিতেই যেন জ্বর ছেড়ে গেল। আত্মীয়-স্বজন, ব্যাধিগ্রস্ত, শোকগ্রস্ত, দুঃখের ভারে পীড়িত, সুখের আতিশয্যে স্ফীত অনেকের নাম করে করে ক্রমাগত ডুবের পর ডুব দিয়ে যাচ্ছি; খেয়াল নেই যে এ জল ভীষণ গরম এবং আমার মাথাও তথৈবচ, তা আমার অধীনেও থাকে না। মাথা ভীষণ ঘুরে উঠল, তখন জল ছেড়ে আমিও উঠলাম। কাছে-পিঠে অবাঙালী দেখলেই আমার রসনা হিন্দী বলবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে, আর উত্তরাখণ্ড তো হিন্দীরই রাজ্য. এক বিশাল-বপুধারিণী রমণী উন্মুক্ত স্ফীত উদরটি নির্দ্বিধায় মেলে দিয়ে সিঁড়িতে আমার পাশে বসে স্নান করছিলেন, অর্থাৎ মগ দিয়ে জল ঢালছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম সেই অনাদি অনন্ত প্রশ্ন—কাঁহাসে আয়ি মাঈ? আপ ক্যায়সে আয়ি, পায়দলমে না কি বাসমে? আগারি কি কেদারজীকি দর্শন হুয়া, না কি বদরিনাথমে এই পহেলা আয়া?

তিনি হেসে মাথা নেড়ে জবাব দিলেন। স্নান সারা হল। স্নানাবসানে শুদ্ধ ক্ষৌম বস্ত্র পরে সারি সারি চলেছেন পূজারিণীর দল, পুরুষও আছেন অনেক। কি-ই বা পূজার উপচার, পাঁচসিকা, আড়াই টাকার ডালি, তাতে কয়েকটি ছোলার দানা, নকুল দানা, শুকনো নারকেলের দুই একটি কুচি, দুই-একটি শুকনো খেজুর আর অতি কষ্টে যেন উঁকি দিচ্ছে দুই-একটি কিসমিস। এই দুর্গম তীর্থে আর কিই বা মিলবে? বন্য ফুল আর তুলসী, পাহাড়ে যা পাওয়া যায় তাই নিবেদিত হয় নারায়ণের চরণে।

ভুজ্যের চাল, ডাল ইত্যাদি পাণ্ডার ছড়িদারই আমাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কিনে আনলেন। একটি নারকেল ত্রিভুজের মত করে সামান্য

একটু কাটা, এর ভিতরে যার যার ইচ্ছা বা সাধ্যানুযায়ী দক্ষিণা দিতে হয়। এর নাম গোপনদান। সোনা ও রূপার ছোট্ট দুইটি টুকরো এনেছিলাম—তারই একটি আর কিছু দক্ষিণা ঐ নারকেলের মধ্যে ভরে তীর্থগুরুর হাতে দিলাম। তিনি মন্ত্র পড়াতে লাগলেন। অভ্রভেদী গিরিবেষ্টিত উত্তুঙ্গ নারায়ণ পর্বতের সানুদেশে বসে মন্ত্রপাঠ করতে করতে হৃদয় এক অনির্বচনীয় সুধারসে ভরে উঠল। সব মন্ত্রের শেষে পুরোহিত আমাদের বলালেন, 'সোয়ালক্ষ তীর্থ আর হিমালয়ের লক্ষ শৃঙ্গ অতিক্রম করে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি—হে তীর্থরাজ বদরি-নারায়ণ, তোমার চরণপ্রান্তে। তুমি আমাকে দর্শন দাও, কৃপা কর, সার্থক কর আমার তীর্থে আসা, আমার এই দীন পূজার অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।' সদ্যোস্নানসিক্ত দেহে পবিত্র ক্ষৌম বসনে আবৃত হয়ে স্থানে স্থানে বসে পূজা করছেন শত শত যাত্রী, পুণ্য অলকানন্দার তটে দেবতাত্মা হিমালয়ের বুকে। পূজার্থীদের কণ্ঠোচ্চারিত স্তবমন্ত্রের ধ্বনি যেন অসীম আকাশের পানে যাত্রা করেছে। কি পবিত্র, কি মহিমাময় এই বিরাটের পদতল, সমস্ত মোহমালিন্য মুছে গেছে; সকলের মুখে প্রসন্ন দীপ্তি। সার্থক আমাদের যাত্রা, ধন্য আমাদের জীবন।

মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। হাতে তাঁর পূজার ডালি, সামান্য বন তুলসী পুষ্পের সঙ্গে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম নিজের হাতে নয়। নারায়ণ আমাদের স্পর্শসীমার বাইরে। গর্ভগৃহে তাঁর মূর্তি আসীন; দরজার পরে একটি কাঠের লম্বা টুল, এইটিই মূলমন্দিরে প্রবেশ পথের বাধা। নারায়ণকে স্পর্শ করা যায় না। ঐ টুলের উপরে একটি বড় পরাত পাতা, টুলের পাশে একজন সেবক বসে থাকেন। আমাদের আনা নৈবেদ্য নারায়ণের সামনে উৎসর্গ করা হল না। ঐ পরাতের মধ্যেই ঢেলে দিলেন সেই সেবক। নারায়ণের দৃষ্টিভোগ। এখান থেকেই আবার কিছু কিছু করে প্রসাদ আমাদের থালায় দিয়ে দিলেন। এখানকার এই নিয়ম, যাঁরা অন্ন বা অন্ন (এখানে যা পাওয়া যায়) কোনও বিশেষ ভোগ নিবেদন করতে চান, তাঁরা টাকা দিলে সেবকরাই ভোগ দিয়ে দেবেন।

নারায়ণের অভিষেক হয়ে গেছে, এখন শৃঙ্গার, রাজবেশে মণিরত্নালঙ্কারে,

রজতশুভ্র বেদীর উপরে ধ্যানাসীন নারায়ণ। কালো কষ্টি পাথরে নির্মিত। নিরাবরণ অঙ্গ আজ একটুক্ষণ দর্শন হঁল। অনেকটাই বুদ্ধদেবের মত। নিচের দুই হাত স্পষ্ট কিন্তু উপরের দুই হাত ও মুখ অস্পষ্ট। তবু অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে শৃঙ্গারের ফাঁকে ফাঁকে আজ সর্বঅবয়ব ও চরণের ক্ষণিক দর্শন হল।

তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করে আশ্রমের পথে রওনা হলাম। পথের পাশে অলকানন্দার ধারে ধারে দোকান, বাজার। কেদার-বদরির চিত্রপট, শিলাজতু, গরম কাপড়-চাদর, মিষ্টি-পুরী ও চায়ের দোকান ; পাহাড়ী ওষুধের কবিরাজী দোকান, মনোহারি দোকান বেশ কয়েকটিই দেখলাম। ছবি, প্রসাদী কুমকুম, আরও টুকিটাকি দুই-একটি জিনিস কিনলাম। 'জলিপার্টি', 'ডানকুনি পার্টি'র ওঁরা অনেকেই আজকেই ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দান করতে চলে গেলেন। আমরা কয়েকজনে কাল পিণ্ড দান করব ঠিক করলাম। আমরা মেঘলোকে আছি, পর্বত শৃঙ্গগুলির কটি মেখলার মত জড়িয়ে আছে মেঘ। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ আকাশে সূর্যদেব কিছুক্ষণের জন্মে দেখা দিলেন। সেই স্বল্প আলোতেই জেগে উঠল নীলকণ্ঠ পর্বতের একটু যেন আভাস। কিন্তু ঐ ক্ষণটুকুই আমাদের কাছে অমূল্য হয়ে রইল।

আবার আরম্ভ হল বৃষ্টি। এই বরফ-গলা বৃষ্টি, আর ঠাণ্ডা হাড়কাঁপানো ; সূঁচ ফোটানো হাওয়া চাদর জামা-কাপড় ভেদ করে যেন বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, হি হি করে কাঁপছি, মাথা ঘুরছে, শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। এ কি হল, এখনই যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ব। অসীম সাহস করে, দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করতে করতে বাইরে বিরাট উনুনটার ধারে গিয়ে বসলাম। সুধীর ওরা গরম জল বসিয়ে রেখেছে এই উনুনে, কাঠের অভাব নেই। আমার ইচ্ছে করছে হাত-পাগুলি ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঢুকিয়ে দিই! বসতে পারছি না, এক-একবার যেন ঢলে পড়ে যাচ্ছি। 'ঠাকুর, প্রভু, বদরি-বিশালা, আমাকে তুমি শক্তি দাও, বল দাও, রক্ষা কর হে দয়াল, মনে মনে জপ করছি আর কাঁপছি। কিছুক্ষণ হাত-পা সেঁকার পরে ধীরে ধীরে যেন একটু চেতনা আর শক্তি ফিরে

এল, সঙ্গে সঙ্গে এল জ্বর ; কিন্তু আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মাথার ঐ অবস্থাটাকেই ভয় পাই, জ্বর আর আমার কি করবে ?

ঘণ্টা দুয়েক পরে আগুন ছেড়ে উঠে এলাম। ততক্ষণে সবাই পিণ্ডদান করে ফিরে এসেছেন—এই দুর্গমেও কুণ্ডু স্পেশ্যালের পরিচারকেরা সমানভাবে আমাদের পরিচর্যা করে চলেছে। আমাদের চা-খাবার, ভাত-রুটি-লুচি, সবই চলছে পুরাদমে। আমরা উপবাসী থেকে সংযত শান্ত চিত্তে তীর্থ করতে তো আসি নি, এসেছি বেড়াতে। কষ্ট কিছুই করলাম না, তবু হিমালয়ের উদার দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হই নি, দুচোখ ভরে দেখছি অনন্ত অরূপের এক প্রকাশ—সীমার মধ্যে অসীমের ইঙ্গিত, মেঘ-মেখলা-পরিবৃত তুষারমৌলী ধ্যান-সমাহিত হিমালয়ের এ কি চিত্তহরণ রূপ। কেবলই মনে পড়ছে বিশ্বকবির 'হিমালয়' কবিতার দুইটি চরণ—

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ ; অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে, অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিৎ
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে

হিমালয়ের সেই বাণী শুনতে হলে কান পেতে থাকতে হয়। হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে যে অরূপের প্রকাশ সেই অরূপের রূপের খেলা চোখ মেলেই তো শুধু দেখা যায় না, তাঁকে অনুভব করতে হয় অন্তরে, তাঁর মৌন গম্ভীর বক্ষে যে অকথিত বাণী তাও তো কানে শোনার নয়, মনের গহনে তার সাড়া পেতে হয়। দিন কাটল আকুল প্রতীক্ষায়, কখন সন্ধ্যা হবে, কখন যাব মন্দিরে। কাল তো দাঁড়াতেই পারি নি, আজ যদি একটু ভাল করে দর্শন হয়।

এখানকার নারায়ণ 'যোগী' (পুরীতে 'ভোগী'), কিন্তু যুগ পাল্টে গেছে তাই যোগীরাজের কাছেও আজ অর্থেরই প্রাধান্য। ছোট মন্দির ; যেখানে ত্রিশজন ঠিকমত দাঁড়াতে পারে না, সেখানে শত শত লোক। দাঁড়ানোই যায় না বসা তো দূরেরই কথা। কিন্তু 'আসন সংরক্ষিত' করলে আর চিন্তা নেই, টাকা দাও, একেবারে মহা কঠোর বাধা পেরিয়ে গর্ভগৃহের দরজায়

সামনেই বস, আরতি দর্শন কর চোখ ভরে, আরও টাকা দাও, তোমার জন্যেও কর্পূর আরতি হবে আর একবার।

সন্ধ্যা হল, গরম জামা, শাল গায়ে চড়িয়ে দ্রুতপদে চললাম। আমার চটিটা ছিঁড়ে গেছে, কেড্‌স্‌ সঙ্গে এনেছি কিন্তু ফিতে-বাঁধা জুতোপরা আমার সাতজন্মেও অভ্যাস নেই, একবার বাঁধো, আর একবার খোলো, কে করে এত ঝামেলা? তাই সকাল থেকে খালি পায়েই হাঁটছি, অবশ্য চটি অক্ষুণ্ণ থাকলেও পাথরের এই উঁচু নিচু রাস্তায় চটি পরে হাঁটা কঠিন, কর্কশ, অসমতল পাথর ছড়ানো পথ, হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, তবুও চলেছি ক্ষিপ্রগতিতে। তীব্র স্রোতে অনেক উঁচুতে বয়ে চলেছেন অলকানন্দা। তাঁর তীরে তীরে বাঁশ আর পাতার (সম্ভবতঃ ভূর্জপত্র) সামান্য ছাউনি। এক একটা ঝুপড়ির মধ্যে বসে আছেন সাধু, ভিখারী আরও কত মানুষ। গায়ে ছেঁড়া জামা, একটা ছেঁড়া কম্বল। তাই সম্বল করে এই তীব্র শীতে হু হু করা অন্তর্ভেদী বাতাসে, অলকানন্দার ঠাণ্ডায় তাঁরা কি করে রাত কাটাচ্ছেন? আমার তো শুধু পায়ে জুতো নেই, আর এঁরা? ছদ্মবেশে হয়তো বা আছেন মহাযোগী কেউ, নয়তো দুঃখী মানুষ, নাই বা পারলাম তাঁদের মত কষ্ট সইতে, কিছুও কি পারব না? মন্দিরে এলাম, আজও সেই ভীড়, সেই ঠেলা-ঠেলি, তেমনই ধমক। আমি তো আমন্ত্রিত নই, রবাহুত, অনাহুত। তাই আজও দ্বাররক্ষী আর সেবকদের ধমকে বাইরে বারান্দায় এককোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার অর্থ নেই, থাকলে সামনে বসে আরতি শৃঙ্গার সবই দর্শন হত, ভক্তিও নেই, থাকলে দূরে বসেও অন্তরে দর্শন হত। কোথায়, হিমালয়ের কোন্ নিভৃত কন্দরে, কোন্ গুহায় আজও তো আছেন কত প্রাচীন ঋষি, মুনি, সাধু তপস্বী, তাঁদের তো মন্দিরে আসবার দরকার হয় না।

আমাদের দলের অনেকেই দুই দুই জনে তের টাকা করে দিয়ে ঠাকুরের সামনে বসার সীট রিজার্ভ করে রেখেছেন। তাঁরা বসলেন। আমার দোসরও কেউ নেই, টাকাও আমার সীমিত, সুতরাং সামনে বসার সৌভাগ্য আমার হল না। আমি ক্ষুদ্র, আসা-যাওয়া খাওয়ার খরচেই আমার হিসাব করা

কয়েকটি মুদ্রা শেষ হয়ে যায়, তীর্থকৃত্যেই পড়ে টান, এমনি আমার আত্মসুখ-লালসা। সামান্য দুই চার পয়সা যা পারি ঐ নগ্নদেহ দীনশীর্ণ মানুষগুলির হাতে দিয়ে যাই, ঐটুকুই আমার পূজা।

আমার প্রাণ নেই, সাধ্যও সীমিত, কিন্তু যাঁর কাছে এসেছি তিনি তো প্রাণারাম, তিনিই তো সাধ্যবস্তু। আমার অক্ষমতা, আমার মানসিক দৈন্য কি তিনি ক্ষমা করবেন না।

কতবার তো ক্ষমা পেয়েছি জীবনে, পেয়েছি অহৈতুকী করুণা, তিনি যে পতিতপাবন।

অনেক দিন আগের কথা আজ মনে পড়েছে

আমার ছোট ভাই মিলিটারী মেজর, আগ্রায় তখন পোষ্টেড্। তার বার বার আমন্ত্রণে স্বামীপুত্রসহ একবার আগ্রায় গেলাম। তাজমহল দেখার সুযোগ কি ছাড়া যায়? না, ছাড়া উচিৎ? ট্রেন থেকে তাজমহল দেখে মন ভেঙে গেল, এই কি সেই বহু বিখ্যাত পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য অতুলনীয় প্রেমের স্মৃতি সমাধি? কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরী হল না। আমাদের ভাগ্যে পরদিনই ছিল শারদ পূর্ণিমা, তাজমহল দেখার শ্রেষ্ঠতম দিন। গভীর রাত্রে তাজমহলকে যখন দেখলাম তখন মুগ্ধ হয়ে গেলাম। নির্মেঘ সুনীল আকাশের গায়ে আঁকা স্বপ্নসৌধ মহান প্রেমের একটি প্রতীক শুভ্র সমুজ্জ্বল তাজমহল।

অধ্যাপক, সাহিত্যিক স্বামী নীরব নম্রশ্রদ্ধায় আবৃত্তি করতে লাগলেন তাঁর অতি প্রিয় শাজাহান কবিতার কয়েকটি চরণ,—

> এক বিন্দু নয়নের জল,
> কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
> এ তাজমহল।

পরদিন গেলাম আগ্রা কোর্ট দেখতে। মোতিমহল, দরবারকক্ষ, স্নানাগার, শীসমহল দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে গেলাম। মোগল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের নিদর্শন, বাদশা-বেগমের বিলাসের কত স্মারক চিহ্ন সেদিনের কত না আয়োজন

আড়ম্বর। অথচ আজ ভগ্নাবশেষরূপে সামান্য চিহ্ন ছাড়া কিছুই তার অবশিষ্ট নেই।

ভাইপো ছোট্টুর বয়স তিন চার বছর, সেও সঙ্গে ছিল। দুর্গের বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, এতক্ষণ এটা কি দেখে এলিরে ছোট্টু? গুরু গম্ভীর দার্শনিকের মতই সে বলে উঠল, 'জমাদারনীকা মোকাম'। (আগ্রা দিল্লী থাকতে থাকতে হিন্দী ভাষাটাই রপ্ত হয়েছে বাংলার থেকে বেশি।)

ছোট্ট ছোট্টু যা বলল তাতে আমরা সবাই হেসে উঠলাম—কিন্তু বৃন্দাবন দর্শন করে যদি বড়রা বলে ওঠেন, 'একেবারে বাজে, কৃষ্ণ এক লম্পট ছোকরা, পাড়ার মস্তান—তারই সব ফষ্টি-নষ্টির জায়গা, এই বৃন্দাবন' তখন হাসির বদলে আসে কান্না।

আগ্রার তাজমহল, দুর্গ, মহান আকবরের শান্ত পুণ্য সমাধি সেকেন্দ্রা দেখবার পরে সদলবলে আমরা বাসে করে বৃন্দাবন রওনা হলাম। সঙ্গে আমার স্বামী, পুত্র, ভাই, ভাই-এর বউ, বউ-এর ভাই, তাঁর বউ-বোনঝি, অনেকে। বাস যতই বৃন্দাবনের কাছে যেতে লাগল ততই মন আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু যমুনার সেতু পার হতে গিয়ে মন বিমর্ষ হয়ে গেল।

'যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী
ও যার বিশাল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্তমণি'

রূপের হাট নয়, যমুনার ঘাটে দেখি রজকিনীরা কাপড় কাচছে, তীরে চরছে দলে দলে ভারবাহী গাধা।

প্রায় বেলা এগারোটায় বৃন্দাবনে পৌঁছলাম। চির-প্রেমের ধাম, শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্তি চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁরই হ্লাদিনীশক্তি শ্রীমতীর প্রেমলীলা-ভূমি। চিন্ময় বৃন্দাবন, চিন্ময় প্রতিটি বৃক্ষলতা, অণুপরমাণু, প্রতিটি ধূলিকণা। পরমভক্ত উদ্ধব এই বৃন্দাবনে গোপীপদরজে বিভূষিত হবার আশায় বৃন্দাবনের তৃণগুল্ম হয়ে জন্মগ্রহণ করার কামনা করছিলেন একদিন। আমার বুক ভরে, মন-প্রাণ মোহিত করে জাগছিল একটিই কামনা, বৃন্দাবনের রজে গড়াগড়ি

দিয়ে এই কলুষিত দেহ ধন্য হোক, গোপী পদধূলির স্পর্শে অন্তর সোনা হয়ে উঠুক। চলেছি দলের থেকে আগে আগে, একটু তফাতে—কিন্তু কানে আসছে তাদের বিদ্রূপ। ও দাদা! দিদির তো দেখছি অবস্থা কাহিল, তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চলুন, নইলে আপনার তো সর্বনাশ, কি কি দিদি গড়াগড়ি দেবেন নাকি ধূলায়? অহাহা এত লজ্জা কেন? আমার স্বামী বেচারা পড়েছেন মুস্কিলে—শালা-শালাজদের হাসি ঠাট্টায় একেবারে যোগ না দিয়েও পারা যায় না, এদিকে আবার স্ত্রীকে রাগানোটাও নির্বোধের কাজ বলেই মনে হচ্ছে, কারণ পরে তো ঠেলা সামলাতে হবে তাঁকেই। অথচ ওদের বিদ্রূপগুলিও উপভোগ করছেন মনে মনে। কৃষ্ণের উপর একটু রাগ তো আছেই। আমি বাড়িতে কৃষ্ণের যে ছবি পূজা করি তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলতে শুনেছি, 'দুষ্টু কোথাকার আমার বউটাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে'। বৃন্দাবনে এসে তাই একটু দুর্ভাবনা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। দানগলি, মানগলি, রাসস্থলী এক মন্দির থেকে আর এক মন্দির পরিক্রমা করে করে চলেছি—কিন্তু বেলা বারোটা বেজে গেছে তাই প্রায় সব প্রধান মন্দিরই গেছে বন্ধ হয়ে—পাঁচটার আগে খুলবে না। ব্যর্থ, ব্যর্থ আমার বৃন্দাবনে আসা। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সবই সহ্য করা যেত যদি তাঁর কৃপা লাভ করতাম। তাও তো পেলাম না। রাসস্থলী মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতীব সঙ্গে সেখানে ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণেব নিত্যরাস, যেখানে বৃক্ষরাজীও মাথা লুটিযে পুণ্যভূমি স্পর্শ করে রয়েছে, কিন্তু আমার হৃদয় এমনই কঠিন, এমনই ভঙ্গুর আমার মন আমি তাঁর চরণ ধূলায় ধূসব হতে পারলাম না। লজ্জা আর অভিমান আমাকে লুটিয়ে পড়তে দিল না।

গোবিন্দজীর মন্দিবে গেলাম। তখন বেলা চারটা, এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে নইলে শেষ বাসও ছেড়ে যাবে। দুর্ভাগ্য এ মন্দিরও বন্ধ। পূজারী বললেন, 'পাঁচটার আগে দরজা খোলা হবে না, নিয়ম নেই।'

খুলবে না, তোমার দরজার বাইরে থেকেই দূর করে দেবে প্রভু? বুক ভরে উঠল কান্নায়, নির্বাক ব্যথার ভারে চোখে এল অশ্রু। যুক্ত করে অদৃশ্য দেবতার পায়ে প্রণাম নিবেদন করে ফিরে চললাম, ওরা তাড়া দিচ্ছে সময় নেই, সময় নেই, কৃপা নেই, কিছুই নেই আমার। হঠাৎ কে একজন বললেন, 'মাঈ যেও না,

মন্দির খোলা হচ্ছে এখনই।' অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখি, ঘণ্টাধ্বনি করে অসময়ে দরজা খুলে দিলেন পূজারী। দুই নয়ন ভরে উঠল অশ্রুধারে, হৃদয় ভরে উঠল মধুরসে, আমি তাঁর শ্রীমূর্তি দর্শন করলাম—লুটিয়ে পড়লাম তাঁর চরণতলে, পূজারী এনে হাতে দিলেন পাঁচটি অমৃতস্বাদী ক্ষীরের মৃৎপাত্র। বললেন, 'লাও মাঈ, গোবিন্দের আসল অমূল্য প্রসাদ।'

দিনের শেষে হতাশার শেষ সীমানায় এনে এ কী তোমার করুণা প্রভু! কৃত কৃতার্থ, ধন্য আমি। আর দুঃখ নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, আমার স্বামী উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদছেন। সারাদিনের হাসি আর উপহাস অশ্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে শ্রীরূপ গোস্বামীর সাধনপীঠ দর্শনে। ধন, মান, পাণ্ডিত্য সমস্ত তুচ্ছ করে বৃন্দাবনে এসে কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন দুই ভাই শ্রীরূপ-সনাতন, মহাপ্রভুর নির্বাচিত, কৃপাপ্রাপ্ত দুইজন।

রাজরাণী মীরাবাঈ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হয়ে যখন পথে বাহির হলেন, তখন একদিন এলেন বৃন্দাবনে। শুনেছেন বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীরূপের কথা। তপস্বিনী মীরা শ্রীরূপের দর্শন কামনা করে খবর পাঠালেন তাঁর কাছে। বার্তাবহ ফিরে এল 'কঠোর বৈরাগী শ্রীরূপ নারীমুখ দর্শন করেন না' এই বার্তা নিয়ে।

কৃষ্ণময়ী মীরাবাঈ আবার বলে পাঠালেন, 'গোস্বামী প্রভুকে গিয়ে বল, আমি জানতাম না শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া বৃন্দাবনে দ্বিতীয় পুরুষ কেউ আছেন, নিশ্চয়ই ললিতাজীও জানেন না, জানলে রাধারাণীর সীমানা থেকে তিনি কবেই ঐ পুরুষকে বহিষ্কৃত করে দিতেন।

শ্রীরূপ এতক্ষণে বুঝলেন কাকে তিনি করেছেন প্রত্যাখ্যান, কাকে তিনি ভেবেছেন 'নারী', ইনি যে রাধারাণীরই নির্বাচিতা সখী।

শ্রীরূপ দর্শন করলেন মীরাবাঈকে, মীরাও দর্শন করলেন শ্রীরূপকে।

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে

মীরাবাঈয়ের প্রেমাশ্রুধারার একটি বিন্দু বুঝি অধ্যাপকের হৃদয় সিক্ত করে দিল—তিনি স্নিগ্ধ হয়ে গেলেন।

কাশীতে গিয়েছি একবার, স্বামীও আছেন সঙ্গে। উঠেছি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে, আছি মহারাজ বিশুদ্ধানন্দজীর পুণ্য সান্নিধ্যে। অচেনা জায়গা, তুইজনেই সেখানে নতুন। তবুও মিশনের পাণ্ডা বা পরিচিত কাউকে সঙ্গে না নিয়েই রাত্রে বিশ্বনাথের শয়ন, আরতি ও শৃঙ্গার দর্শন করতে গেলাম। দেখতে দেখতে ভস্ম আর চন্দনে লিপ্ত, ফুল আর মালায় বিভূষিত লিঙ্গরাজ যেন জটাজুট-বিলম্বিত, ব্যাঘ্রাম্বর-পরিহিত, চন্দ্রচূড় মহাদেবের মতই রূপ পরিগ্রহ করলেন। চারিদিকে সুগম্ভীর বেদমন্ত্র পাঠ করছেন চতুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ, বেজে উঠেছে শঙ্খ-ঘণ্টার মধুর রব, দীপবর্তিকায় জ্বলে উঠেছে প্রদীপ। অপূর্ব এ শৃঙ্গার-আবতি দর্শন করে এতই মুগ্ধ হয়ে গেছি, খেয়াল নাই কখন একে একে দর্শনার্থীরা বিদায় হয়ে গিয়েছেন। শূন্যপ্রায় অঙ্গনে তুই-এক জন পাণ্ডা ছাড়া আর কেউ নেই। রাত্রি বারোটা বাজে, অন্ধকার রাত্রি। জুতো বাইরে কোথায় রেখে এসেছি খুঁজে পাচ্ছি না। জুতো খুঁজতে খুঁজতে রাস্তা গেল হারিয়ে। কি যেন এক গোলকধাঁধায় পড়ে গেলাম। অন্নপূর্ণাজীর মন্দিরের গলিপথ দিয়ে বাইরে যাবার একটা পথ আছে—কিন্তু সে গলি বা দরজাও খুঁজে পাচ্ছি না। আতঙ্কে 'পাণ্ডা'-কেও জিজ্ঞেস করতে পাচ্ছি না। কারণ কাশীতে কে পাণ্ডা কে গুণ্ডা চেনা অসম্ভব। 'কেন মিশনেব সাধুদের নিষেধ অমান্য করে এত রাত্রে তাদের পাণ্ডা সঙ্গে না নিয়ে এলাম। এই তো মাত্র সেদিন এক স্বামীর সামনে থেকেই ছিনিয়ে নিযে গেল তাঁর যুবতী স্ত্রীকে, ধর্মশালা থেকে উবাও হল এক মেয়ে, বিশ্বনাথের গলিতে ঘটছে নানা অঘটন।' কাশীর গলি, কোথায় যেতে কোথায় গিযে সর্বনাশেব মুখে পড়ব কে জানে। তুইজনেই স্তব্ধ বিবর্ণ মুখে ঘুরছি, হঠাৎ দেখি একটি সাত-আট বৎসরের শ্যামবর্ণা মেয়ে, 'অন্নপূর্ণাজীকি মন্দির তো ইধারী হ্যায়' বলে হাত দিয়ে দিক নির্দেশ করে এক ঝলকে চলে গেল। তাকিয়ে দেখি, অদূরেই অন্নপূর্ণা মন্দিরে যাবার পথ। এতক্ষণে চোখের তিমিরাবরণ কি অপসারিত হল? ভাবলাম যাত্রীদের কারও সঙ্গে বুঝি মেয়েটি এসেছে, সে তার সঙ্গীদের ডাকছে, তারাও বুঝি যাবে অন্নপূর্ণার মন্দিরে। ভগবানের দয়া, মাঝ থেকে আমরাও গন্তব্যের নির্দেশ পেয়ে গেলাম।

কিন্তু পব মুহূর্তে মেয়েটিকে আর দেখলাম না। সঙ্কট পাব হয়ে সঙ্কট মোচনীর কথা মনে পড়ল, কিন্তু আর তাকে দেখতে পেলাম না। একি অবিশ্বাসীর পরীক্ষা, ছলনা, না কি করুণা?

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

ভ্রান্তির সৃষ্টি করে এতক্ষণ যিনি ভয় আর আতঙ্কের শেষ সীমায় নিয়ে এলেন, মুহূর্তে তিনিই আবার দেখিয়ে দিলেন তাঁর দরজা, মুক্তির ইঙ্গিত।

যিনি সকল ভয়েব ভয় তাঁর কাছ থেকেই চরম বিপদের মুহূর্তেই লাভ করা যায়।

এই হিমালয়ের এক মেঘাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পথ হারিয়েছিলেন 'মহাপ্রস্থানের পথে'ব লেখক শ্রীপ্রবোধকুমার সন্যাল। সঙ্গীবিহীন, নিরস্ত্র, অন্ধকারে পথরেখা বিচ্ছিন্ন, ভয়ে আতঙ্কে যখন তিনি অবশ-প্রায় হয়ে এসেছেন তখন অকস্মাৎ একটি যেন পাহাডী মেয়ে, গলায় তার কয়েকছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় চুল চূড়া করে বাঁধা, হাতে শিঙা, সামনে এসে দাঁড়াল। পথহারা যাত্রীকে বিপদসঙ্কুল নদী পাহাডেব সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অনায়াসে উত্তীর্ণ করে দিল, তারপর অন্ধকাবেব মধ্যেই ক্ষিপ্রগতিতে মিলিয়ে গেল কোথায়, কোন্ দূরে লেখক আর তাকে দেখতে পেলেন না। ফিরে এসে যখন ঘটনাটা তাঁর সঙ্গীদের কাছে বললেন, তখন 'অবিশ্বাসী' তাঁরও মূল্য যে কতখানি বেডে গেল সেটা তাঁর লেখা থেকে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—

"এ কদিন আমি নাস্তিক ও অধার্মিক বলে পরিত্যক্ত হয়েছিলাম। গল্পটা শুনে হঠাৎ বুড়ীর দল এগিয়ে এসে আছড়ে পড়ে বলতে লাগলো, 'কে বাবা মানুষের ছদ্মবেশে কে বাবা তুমি? আমরা পাপী, অধম, তুমিই বাবা দর্শন পেয়েছ সেই মা ভগবতীর। কোন্ দিকে সে গেল বাবা কোন্ পথে? তুমি জড়িয়ে ধরলে না কেন বাবা? পায়ের ধুলা কেন নিলে না? আহা তুমি ব্রাহ্মণ, ধার্মিক তোমার মতন মহাপুরুষ , আমাদের অপরাধ নিও না বাবা, তুমি যে কে আমরা এতদিনে—"

হাসি চেপে চোখ বুজে বসেছিলাম, এবারে দুইহাত বাড়িয়ে বরাভয় দিয়ে দেবজনোচিত কণ্ঠে বললাম, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। চারুর মা চুপি চুপি এসে পায়ের ধূলা মাথায় তুলে নিল।

হিমালয়ের পথে বহু ভক্তেরই এরকম অলৌকিক দর্শন ঘটে, লাভ হয় অহৈতুকী কৃপা। আর্ত, পথভ্রান্ত আরও কতজনের তীর্থযাত্রা পথে এমনি যে কত করুণার আবির্ভাব ঘটেছে, হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনীগুলি পড়লেই তার প্রমাণ মিলে।

চিত্ত পিপাসিত, মন বিষণ্ণ, 'আজও দাঁড়িয়ে আছি মন্দিরের সামনে, একধারে ভিখারীর মত। আমাদেব সঙ্গীদের অনেকেই টাকা দিয়ে আজ সামনে বসে' আরতি দর্শন করবার অধিকার অর্জন করেছেন, পাণ্ডা ধীরেন ভট্ট মশায়ও আছেন তাঁদের সঙ্গে। আজও মন্দিরে ভীড়, আজও আমার আশা নেই। বিতাড়িত, ভাগ্যহত—তাই দাঁড়িয়ে আছি দূরে। এর মধ্যে দুই তিনবার আরতি হয়ে গেছে, আবার হবে। ভীড় যেন আস্তে আস্তে একটু কমছে। হঠাৎ সেই নির্মম দ্বাররক্ষীই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আরতি দেখেগি মাঈজী' ?

কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম—'দেখাবে ?'

আমার হাত ধরে সেই কঠোর কঠিন রক্ষীটিই একেবারে ঠাকুরের প্রায় সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তখন কুণ্ডুর পাণ্ডাও ডাকলেন আরও সামনে সংরক্ষিত আসনে বসবার জন্যে। কিন্তু আর আমার দবকার ছিল না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া টাকা দেব না অথচ সুবিধা নেব, সেটা উচিতও নয়, রুচিতেও বাধে।

আরতি আরম্ভ হল আবার, দুই চোখ মেলে চেয়ে রইলাম। পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ আনন্দ, আর কি থাকে বাকি ? কাঁদলাম প্রাণভরে, ওগো দীননাথ, দীনের প্রতি কত তোমার করুণা।

বাইরে এসে দ্বাররক্ষীর দুটি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা, তোমার নাম কি ? তোমাব অনুগ্রহেই আজ আমার 'দর্শন' হল, তোমাকে আমি

কি দেব বাবা? এই টাকাটা রাখ, কিছু কিনে খেও।" আমার কান্না দেখে বুঝি আরও নরম হল তার মন; বলল, 'আমার নাম পুষ্কর; মাঈ। তুমি কিছু ভেব না, তোমাকে আমি সব দর্শন করিয়ে দেব; কাল সকালে এস আবার।'

পরিপূর্ণ মন নিয়ে চলে এলাম আশ্রমে। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া হল। গরম জল করে দিচ্ছে, কিন্তু গন্ধকের গন্ধে সে জল খাওয়া দুঃসাধ্য, অথচ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গেলেও ঠাণ্ডা জল গলায় ঢালা আরও দুঃসাধ্য।

আজও সেই বন্ধ ঘরেই শোওয়া। ঘুম নেই, বার বার উঠতে হচ্ছে। বরফগলা জলে হাত-পা ধুতে ধুতে জমে যাচ্ছি। শ্বাসকষ্ট, আর কি যে অস্বস্তিতে ছটফট করি আর ভাবি, কেন আমার এই কষ্ট। সবাই তো সুখ-নিদ্রায় অচেতন, আমার কেন এই দুর্ভোগ?

হঠাৎ যেন মনের আবরণ ঘুচে গেল। যখন এই গভীর নিশীথে সর্ব কোলাহল স্তব্ধ, চরাচর শান্তিমগ্ন, মহাবিশ্বের মহাকাশে অভ্রভেদী উচ্চশির দাঁড়িয়ে আছেন মহাকালরূপী হিমালয়। কি অপরূপ রূপ—

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।

উঠে বসলাম। জীবনের কত রাত্রিই তো সুখ-নিদ্রায় কেটেছে। এখানে এসেও কি সেই একই আবাসের ভাবনা! সাধনা নেই, নেই কোন তপস্যা। কি অধিকারে, কোন্ পুণ্যের ফলে এসেছি এই অমৃতলোকে? একটু নাম করি —তাঁরই নাম। হয়তো বা তাই-ই নারায়ণের ইচ্ছা, দুঃদহনের ছলে এই তাঁরই মহাকরুণার আহ্বান।

আজও ভোরেই তপ্তকুণ্ডে স্নান। তারপর শৃঙ্গার বেশে নারায়ণ দর্শন।

আজ বদরিজীর মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় আধমাইল দূরে ব্রহ্মকপালীতে পিণ্ডদান করব আমরা কয়েকজন। এর জন্যে আলাদা পুরোহিত থাকেন,

কিন্তু আমাদের কিছুই করতে হল না, কুণ্ডুর নির্দিষ্ট পুরোহিতই নিয়ে গেলেন আমাদের। পিণ্ডদানের জন্য যা যা প্রয়োজন ওঁরাই কিনে দিলেন, আমরা পয়সা দিয়েই খালাস। নারায়ণের অন্নপ্রসাদ, হলুদ, চন্দন আর সামান্য চাউল, কুশ প্রভৃতি উপকরণ সহ একটা করে থালা দোকানীরাই দিয়ে দিল, আমরা হাতে করে নিয়ে চললাম।

জুতো রাখবার ঘর আছে, ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা সেগুলি বুঝে রাখছে, সামান্য পয়সা দিলেই ওরা খুসী। ছেঁড়া, ময়লা শীতের অতি সামান্য এক-একটা জামা গায়ে, পরনে লম্বা পাজামা, তাও ছেঁড়া, আর তার গায়ে লেগে আছে কতকালের ধূলা-ময়লা তার হিসাব করা মুস্কিল। কিন্তু পঙ্কে জাত পঙ্কজিনী—শৈবালে অনুবিদ্ধ হয়েও স্নিগ্ধ বর্ণ মাধুর্যে রম্য, তেমনি দারিদ্র্য-পঙ্কে-জাত এই সব ছিন্নবসনা মলদিগ্ধাঙ্গিণী কমলাননা পর্বতদুহিতা পার্বতীরাও মনোহারিণী। শীতের নিষ্ঠুর আঘাতে মুখগুলি ফেটে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে থেকেই ফুটে বেরুচ্ছে গোলাপী আভা, গালদুটি রক্ত-গোলাপের মত রাঙ্গা। কারও নাম লাছমি, কেউ দোজু, কেউ পীতম্-কারও নাম বুঝি বা রিজু। এরা গাড়োয়ালী মেয়ে, ছুটোছুটি করছে, পাহাড়ী ঝর্ণার মতই চঞ্চল, তেমনই নির্মল। কুমারী গৌরীও তো এই হিমালয়ের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।—এমনি পাহাড়ী বালিকাদের মতই কি তিনি ছিলেন না সুন্দর, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা?

পাণ্ডার সঙ্গে ব্রহ্মকপালীতে পৌছলাম। অলকানন্দার তীরে তীরে সমতল পথ—চড়াই নেই, তাই কষ্ট হল না।

অলকার পবিত্র জল মাথায় স্পর্শ করে এক এক সঙ্গে কয়েক জন করে পিণ্ডদান করতে বসলাম। নারায়ণের অন্ন-প্রসাদের সঙ্গে হলুদের মতই একটা কি বাটা মিশিয়ে নিলাম। তাই দিয়ে সতেরোটি ছোট ছোট পিণ্ড তৈরী করতে বললেন পাণ্ডাজী। তাই করলাম। প্রথমে পিতামাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী, পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুলের উর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের পিণ্ডদান করা হল।

অনুভব করলাম যেন প্রসন্ন উজ্জল মুখে আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন আমার ঋষিতুল্য পিতা। মুক্তপুরুষ তিনি, এই অদ্বৈত-জ্ঞানের রাজ্যে,

অসীম এই আনন্দলোকে ধ্যানে সমাহিত আত্মদ্রষ্টা ঋষিদের চরণ-সান্নিধ্যেই তাঁর স্থান পুরুষ। মার জন্যে বুক ভরে এল কান্না। মায়ের আমার এখানে আসার বড় ইচ্ছা ছিল। ডাকলাম কাতর হয়ে, মাগো তুমি সূক্ষ্ম দেহে এস, তোমার দুর্ভাগিনী কন্যার হাত থেকে গ্রহণ কর এই অমূল্য প্রসাদ।'

রবি আমার পরম আদরের ছোট ভাই। সে চলে গেছে অকালে; তাকেও আহ্বান করলাম, বুক ফেটে যাচ্ছে তবুও যেন তৃপ্তি পাচ্ছি। তারপর স্বামী, অভিন্ন-হৃদয়, অভিন্ন-আত্মা—তবুও আজ আমি একা, ভিন্ন দেহে বিরহতপ্ত অন্তরে তাঁকেও ডাকলাম। তাঁর মর্ত্য-জীবনের খেলা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার তো হয় নি। এই নারায়ণ-ক্ষেত্রে, এই অমৃতলোকে তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আসুন, বদরিবিশালার মধ্যে সকল ক্ষুদ্রত্বের লয় হোক— এই অদ্বৈত ব্রহ্মের মধ্যে অহংরূপী দ্বৈত সত্তার পরম আশ্রয় লাভ হোক এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হল আমাদের উচ্চারিত মন্ত্রে, আমাদের অশ্রুজলের তর্পণে। গাড়োয়ালী পুরোহিতের অতিদ্রুত উচ্চারিত সব মন্ত্র বুঝতে পারলাম না। কিন্তু অনুভূতি দিয়ে অপূর্ণকে পূর্ণ করে নিলাম।

বাংলা ভাষার জন্যে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখার জন্যে যাঁরা ১৯১১-এর বলি হয়েছিলেন, নিহত, মৃত, নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের উদ্দেশেই তর্পণ করলাম, পিণ্ডদান করলাম। 'পৃথিবীর যে যেখান থেকেই চলে গেছ, সকলে তোমরা আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ কর, আনন্দলোকে তোমাদের গতি হোক, তোমাদের আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুন,' নারায়ণের চরণে এই কামনা জানিয়ে পিণ্ডদান ও তর্পণ শেষ করলাম। অতীনদা আছেন কি না জানি না তবুও তাঁকেও স্মরণ করলাম, প্রসাদ নিবেদন করলাম শ্রদ্ধার সঙ্গে। তারপরে ফিরে গেলাম আস্তানায়।

আজ সূর্য একবার উঁকি দিয়ে আমাদের দুর্দশা দেখেই বোধ করি কিছুক্ষণের জন্য মুচ্‌কি হেসেছিলেন। তাঁর সেই হাসির আলোকে নীলকণ্ঠের ক্ষণিক-দর্শন হল। ওদিকে নর-পর্বতেও দুই-একটি তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা গেল, কিন্তু এত ক্ষণিক যে দু'চোখ ভরে দেখতে তা পেলাম না। তবে আজ কুয়াশা খুব কম, মেঘও যেন কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সুনীল আকাশের স্বচ্ছ মুখও দেখতে

পাচ্ছি। মোহনানন্দজীর আশ্রমে যে সাধু থাকেন তিনি আমাদের কাছে আজ বদরিজীর কথা, মন্দির-প্রতিষ্ঠার কাহিনী, নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের কঠোর তপস্যার কথা, সুন্দর সুমধুর কণ্ঠে বর্ণনা করলেন। আমরা তাঁকে ঘিরে বসে সে পুরাতন কিন্তু চির-নতুন কথা শুনছি; মনে হচ্ছে সত্যিই পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবার হিংসা-দ্বেষ-কলহ-মালিন্য সব ঝেড়ে ফেলে রেখে এই অমৃতলোকে এসেছি আমরা কয়েকজন মর্ত্যের প্রাণী। কেমন করে কোন পুণ্যে এই অসম্ভব সম্ভব হল? কোনও ক্লেশ কোনও দুঃখ-বরণই তো আমরা করি নি, তবুও এসে পৌঁছলাম তাঁর দরজায়।

যুগ যুগ আগে যখন আধুনিক সভ্যতার কণামাত্রও এই উত্তুঙ্গ তীর্থভূমিতে এসে পৌঁছায় নি, তখন যে দুইটি দুর্গম ভয়সঙ্কুল পথে ভক্তদের এসে পৌঁছাতে হত তাঁর দরজায়, তাদের নাম ছিল 'মনোভঙ্গ' আর 'চিৎভঙ্গ'। হিংস্র জন্তু-অধ্যুষিত ভীষণ অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে, খরস্রোতা অলকানন্দা আর মন্দাকিনী উচ্চে-বাঁধা দুইটি মাত্র দড়ির সাহায্যে পার হয়ে, তুষারাবৃত, প্রস্তরাস্তীর্ণ দুরারোহ উৎরাই-চড়াই পথ অতিক্রম করতে হত তাঁদের দিনের পর দিন। সকল তীর্থযাত্রীই তো শেষপযন্ত পৌঁছাতে পারতেন না লক্ষ্যে। সমুখের অফুরান দুর্গমতর পথের চিন্তা-ভাবনায় হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য-মাধুরী একসময় রূপান্তরিত হত রুদ্ররূপে, তুহিন-শীতল মৃত্যু দশ হাত বাড়িয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসত। তখন যাদের মন ভেঙে যেত, আতঙ্কে কষ্টে যন্ত্রণায় ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে, এই আত্মীয়-বন্ধুবিহীন হিমালয়ে তাঁদের চিত্ত বিকল হয়ে উঠত, হয়তো বা অন্তিমের আর্তনাদ ধ্বনিত হত হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, তখন তীর্থদেবতা কি সেই মৃত্যু পথ-যাত্রীকে দর্শন দিতেন না? তাঁদের দেহ লুটিয়ে পড়ত মহাপ্রস্থানের সীমারেখাহীন পথে; তাঁদের প্রাণ কি প্রাণারামের চরণ লাভ করত না? আর যাঁরা যুধিষ্ঠিরের মত পেছন পানে না তাকিয়ে চলতেন একনিষ্ঠ মানসে আর অটল বিশ্বাসে, তাঁদের মনোভঙ্গ আর চিৎভঙ্গ হত না। তাঁরা তাঁদের মর্ত্য দেহ নিয়েই অমৃতের সন্ধান পেতেন।

এই দেবতাত্মা হিমালয়ের গিরি গহ্বরে, কন্দরে কন্দরে—এই তপোলোকে, আজও তো লোকচক্ষুর অগোচরে তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে আছেন কত যুগ-

যুগান্তরের ঋষি-মুনি। এই তুষার-রাজ্যে, নগ্নদেহে অর্ধাশনে, অনশনে, এক-ধ্যানাসনে বসে আছেন তাঁরা কিসের সন্ধানে! 'নাল্পে সুখমস্তি', আমাদের মত অল্প নিয়ে, শুধু পল্লবগ্রাহী হয়ে তাঁরা সুখী হতে পারেন নি। তাই 'যদ্ ভূমা তদ্ এব সুখম্'—ভূমানন্দের সন্ধানে এসেছেন এই আনন্দধামে, পেয়েছেনও সে সন্ধান, তাই দেহকে তুচ্ছ করতে পেরেছেন তাঁরাই।

মোহনানন্দ স্বামীর আশ্রমের সাধুমহারাজও আমাদের এই কথাই বললেন, 'কি দেখলেন বদরিনারায়ণকে? তাঁর চতুর্ভুজ দর্শন হয়েছে কি? বদরিনাথের সত্য স্বরূপ দেখা কি এতই সহজ? থাকতে হয় দীর্ঘদিন এই ধামে, করতে হয় কঠোর সাধনা তবেই মেলে ইঙ্গিত—এই জাগ্রত-চেতন হিমালয়ের বক্ষে ঘটে চৈতন্য স্বরূপের সাক্ষাৎ-দর্শন।'

বিকালবেলা মন্দির-সংলগ্ন বাজারে ঘোরাফেরা করছি—অত্যন্ত জল-পিপাসা কাছে কোথাও জল দেখছি না। এক পুরী মিষ্টির দোকানদারকে আমার স্বভাষিত স্বরচিত হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা, ইধার পানি কাঁহা মিলতা? হামারা বহুত পিয়াস লাগতা হায়।'

দোকানী বয়স্ক, অত্যন্ত ভদ্র; তাঁর ভাষাতেই বললেন, 'দিচ্ছি মাঈ'। সুন্দর ঝকঝকে একটা লোটায় তাঁর কর্মচারী জল এনে দিলেন। গজার মত কি একরকম মিষ্টি থরে থরে সাজান। দাম জিজ্ঞাসা করে সামান্য কিছু নিলাম। জল আর মিষ্টি খেয়ে এতক্ষণে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হতে দোকানীকে ধন্যবাদ সহ মিষ্টির দাম দিতে গেলাম, বললাম, 'পানি দিয়া আপ, হামারা বহুত তৃপ্তি হুয়া—আপকা বহুত ধন্যবাদ, মিষ্টিকা দামটা লিজিয়ে।' তিনি বিনয় সহকারে বললেন, 'না মাইজী তুমি জল চেয়েছ, সঙ্গে সামান্য একটু মিষ্টি নিলে, তার আবার কি দাম নেব আমি? না মাঈ তুমি দাম দিও না'। আমি আবারও অনুরোধ করলাম, 'না বাবা, এ কেয়া, এ তো আপকা, ব্যবসা হায়—দাম না লেনেসে ক্যায়সে দুকান চলতা হায়?' 'হায়' 'হায়' করতে করতেই কোনও রকমে আমার মনের কথাটা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দোকানদার মশায় আমার এত 'হাহা-কার' সত্ত্বেও দাম নিলেন না।

বাজারের সামনেই অল্প দূরে বদরিকাশ্রমে পঞ্চতীর্থের এক তীর্থ কূর্মধারা।

কেউ সঙ্গে নেই—একা একাই ঘুরছি আর দুই চোখ ভরে হিমালয়কে দেখেছি। ঋষি-গঙ্গা অথবা সূর্য কুণ্ড, কূর্ম-ধারা, প্রহ্লাদ-ধারা, তপ্তকুণ্ড আর নারদকুণ্ড এই পাঁচটি এখানকার তীর্থ। তাছাড়াও নারদশীলা, বরাহশীলা, গরুড়শীলা প্রভৃতি আরও কয়েকটি দর্শনীয় পুণ্যস্থান আছে। কিন্তু আমাদের এই স্বল্প-অবস্থানে আর কিছুই দেখা সম্ভব হল না।

বাজারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি গোধূলির রক্তরাঙা আকাশে রক্তিম সুষমায় মণ্ডিত নীলকণ্ঠ পর্বতের শীর্ষদেশ। আবার নর-পর্বত এবং অন্যান্য পর্বতেও তুষারাবৃত শিখর দেখা যাচ্ছে। নর-পর্বতের এক ধবল শিখর থেকে নেমে আসছে একটি রূপালী ধারা, কিন্তু দূর থেকে মনে হচ্ছে বরফে জমাট হয়ে আছে এ প্রবাহ। কি সুন্দর! কি অপরূপ! নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে সূর্য অস্তমিত হলেন। চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল—আর কিছু দেখতে পেলাম না।

সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠল। মন্দিরে এলাম। আজ ভীড় কম। আরতি দর্শন করে 'জলি পার্টির' মঞ্জুদিদের সঙ্গে মন্দির সংলগ্ন আর একটি ঘরে গিয়ে বসলাম। আজ বীণা মহারাজের গান শুনব। ঘরে সতরঞ্চি পাতা হয়েছে—সামনে একটি উঁচু বেদীতে এসে বসেছেন বীণা মহারাজ। দীর্ঘ পক্ককেশ, রজতশুভ্র দীর্ঘ শ্মশ্রু, দীর্ঘ-দেহী বিরাট পুরুষ। হাতে তাঁর সুরযন্ত্র। কথা বলেন না, মৌন সাধক শুধু গানে গানে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেন তাঁর প্রভুর চরণে। একে একে রামসীতা, হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতীর বন্দনা গাইতে লাগলেন, বার্ধক্যে ন্যুব্জ দেহ, কিন্তু কি অদ্ভুত সুরেলা মধুর কণ্ঠ! ঘরে আরও লোক আছেন, তাঁর ভক্ত সেবক ও বোধ করি আছেন দুইচার জন। স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ আর আমাদের মত বহিরাগত যাত্রীও এসে যোগদান করলেন। মহারাজ শ্লোকের দু'চরণ গাওয়ার পর সমবেতভাবে আমরা সবাই যোগ দিই। আমাদের শেষ হলে আবার তিনি ধরেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক গান হবার পরে মুগ্ধ নম্র চিত্তে তাঁর পায়ে একটি প্রণাম রেখে এলাম, সামান্য কিছু প্রণামীও দিলাম—তিনি চেয়েও দেখলেন না।

আজ শঙ্কর-পন্থী বৃদ্ধ সাধুটিকেও প্রণাম করে সামান্য প্রণামী দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, 'মাঈ যা দেবে তা ঠাকুরকে দাও দু-চার আনা। ব্যস, আউর কেয়া। আমাকে কিছু দিতে হবে না।' বার বাব অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা এ টাকা নিয়ে তুমি তোমার ঘরে রেখে দিও—ইসমে তুমহারা ঋদ্ধি, সিদ্ধি সব মিলেগা।' আবার প্রণাম করে টাকাটা নিয়ে এলাম। 'তোমার আশীর্বাদ পূর্ণ হোক' বললাম তাঁকে। আর কি বলার আছে?

গান শেষ হতে হতে রাত্রি ৮টা বেজে গেছে। আমি জানি না মন্দির কখন বন্ধ হয়। সকাল বেলায় ১'০০ টাকা দক্ষিণা সহ একটি বন-তুলসীর মালা বদরিজীর সেবকের হাতে দিয়েছিলাম নারায়ণের চরণে নিবেদন করার জন্যে। প্রসাদী মালাটা আমি চাইতে তিনি বলে দিলেন সন্ধ্যায় এসে নিতে। এখন এসে দেখি ঠাকুরের শয়নের আয়োজন সমাপ্ত-প্রায়, এখনই মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। প্রসাদী মালা আর একটু পরে এলে আর পাওয়া যেত না। সেবক মালাটি দিলেন। মাথায় ঠেকিয়ে বাইরে এলাম। পুষ্কর আমার হাতে প্রসাদী একটি শুষ্ক ব্রহ্মকমল দিল।

বহুশ্রুত এই ব্রহ্মকমল শুষ্ক সাদা পাতলা কাগজের মত কয়েকটি বিশীর্ণ পাপড়ি—বুকে মুখে তার স্পর্শ নিলাম। গন্ধ নেই না থাক, তবুও ব্রহ্মকমল! অবশ্য সকালে মোহনানন্দজীর আশ্রমের সাধু কিন্তু বলেছিলেন ষোল হাজার ফিটের নিচে ব্রহ্মকমল ফোটে না। কৈলাস পর্বতের সানুদেশে মানস সরোবরের তীরে তীরে আর ষোল হাজার ফিট উঁচু পর্বতের তুষারের ফাঁকে ফাঁকে ফোটে সহস্র সহস্র ব্রহ্মকমল, সুদূরপ্রসারী সেই কমলের সুগন্ধ! আমরাও শুনেছি সহস্র বিকশিত কমল-বনে বেশিক্ষণ কেউ থাকতে পারে না! দুঃসাহসী পাহাড়ী যারা ঐ কমল তুলে আনতে যায়, তাদের নাকে পুরু কাপড় বাঁধতে হয় নতুবা ফুলের তীব্র গন্ধে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এখানে যা কেদারশৃঙ্গে যে কমল ফোটে সেগুলি ব্রহ্মকমল নয়, কেদার-কমল! 'শুভ্র তুষারাস্তীর্ণ গিরিবক্ষে যখন সহস্র সহস্র ব্রহ্মকমল ফোটে তখন সেই অনুপম শোভার কাছে নন্দনকাননের সৌন্দর্যও হার মানে'—বললেন সাধুজী

দীর্ঘকাল তিনি আছেন হিমালয়ে, হিমালয়কে ভালবেসে দেখতে পেয়েছেন তাঁর বহু রূপ, জানতে পেরেছেন তাঁর অনেক দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব। পুষ্কর কেদার-কমলেরই একটি আমাকে দিয়েছিল!

দুর্লভ্য ব্রহ্মকমল! এই ব্রহ্মকমলেব একটিকেই কি বাতাস এনে ফেলেছিল পদ্মগন্ধা দ্রৌপদীর কাছে? তারই গন্ধে, সৌন্দর্যে পাগল হয়েই কি কৃষ্ণা ভীমকে পাঠিয়েছিলেন সেই কমল আনতে? বিরাট নগরে দ্রৌপদীর অনুরোধে কীচকবধের কাজটা যেমন আনন্দদায়ক মনে হয়েছিল, এখন ফুল এনে দেবার অনুরোধটা ঠিক তেমন সুবিধাজনক লাগল না ভীমের কাছে। হত কোনও দৈত্যদানব বা রাক্ষসবধের ব্যাপার, তাহলে কোন কথাই ছিল না। 'কি যে মেয়েদের খেয়াল, ফুল কোন্ কাজে লাগে?' ভীম গজগজ করতে করতেই রওনা হলেন। না গিয়ে উপায় কি, 'ফুলের কোমলতা সৌন্দয নিয়েই ওদের জন্ম, তাই ফুলের প্রতি ওদেব এত আকর্ষণ!'

সঙ্কীর্ণ গিরিপথে শুয়ে আছে একটা বানর। স্বভাব-কঠিন কণ্ঠ একটু মোলায়েম করেই ভীম বললেন, সরে যাও, আমায় পথ দাও।' ব্যাধিক্লিষ্ট, ক্ষীণ কণ্ঠে বানর বলল, 'আমার সরে যাবার শক্তি নেই আমি অসুস্থ, তুমি আমাকে ডিঙিয়ে চলে যাও।' বিরক্তি তো ছিলই বানরের ব্যবহারে রাগও হল। বললেন, 'তুমি সর, কোনও প্রাণীকে ডিঙিয়ে যাওয়া অসঙ্গত।' বানর নড়ল না, আবারও বলল 'আমি পারছি না, কি করব বল?'

রাগে ভীমকর্মা ভীম সরাবার উদ্দেশ্যে বানরের লেজটা ধরে টান দিলেন। কিন্তু একচুলও নাড়ান গেল না লেজটাকে। তবুও কিছুটা খুসী হয়েই উঠল তাঁর মন, যাহোক্, 'একটা উচিত মত কাজ পাওয়া গেল। লেজটা ধরে ওই বানরটাকে একবার ত্রিভুবন দেখিয়ে ছাড়বেন, তখন ও বুঝবে তাঁর বিক্রম।' হা হতোস্মি! হার মানলেন বীরোত্তম ভীম, শত চেষ্টাতেও বানরটার লেজ একচুলও নাড়ান গেল না! তখন উঠে দাঁড়ালেন মহাভক্ত, মহাবীর হনুমান। সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন কনিষ্ঠ ভীমকে, ভীম তাঁর ভাই। ভীম পুলকিত ছিলেন! ত্রেতাযুগে মাতা জানকীর সন্ধানে সমুদ্র লঙ্ঘন-কালে মহাবীর যে বিরাট রূপ ধারণ করেছিলেন, ভীম একবার সে রূপ দেখতে চাইলেন। হনুমান

হেসে বললেন, 'সে রূপ তুমি দেখতে চেও না ভাই, সহ্য করতে পারবে না।' ভীম সে কথা শুনলেন না।

তখন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ালেন মহাবীর,—ভীষণ করাল বদন, অগ্নি-গোলকের মত দুই চোখ, পিঙ্গল দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তেজ! হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরকেও অতিক্রম করে সেই দেহ ক্রমেই বিস্তৃত, বিস্ফারিত হচ্ছে! তখন বোধকরি, জীবনে এই প্রথম ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন ভীম! অমনি সেই ভয়ঙ্কর রূপ সংবৃত করে আপন স্বাভাবিক রূপ পরিগ্রহ করলেন হনুমান, ভাইকে দিলেন অভয়!

এরপরে হনুমান-প্রদর্শিত পথে ভীমসেন কুবের সরসীতে বহুসংখ্যক সৌগন্ধিক তরুণ-অরুণাভ কমল সংগ্রহ করে পাঞ্চালীকে উপহার দিলেন।

বদরিনারায়ণের দুই মাইল দূরেই মনিভদ্রপুর গ্রাম, সংক্ষেপে মানাগ্রাম। পর্বতারোহীদের শিক্ষাকেন্দ্র মানা ক্যাম্প সেখানেই অবস্থিত শুনে দেখবার সাধ হল, কিন্তু সাধ্য হল না।

কিই বা দেখলাম! মাত্র তিন-চার মাইল দূরেই পরম পবিত্র তীর্থ বসুধারা অথবা ইন্দ্রধারা। দুর্গম সে পথে পুণ্যবান, কঠোর-কৃচ্ছ্র সাধকরা যেতে পারেন। কোনও নির্দিষ্ট পথরেখা দেখা যায় না। কেবল চড়াইর পর চড়াই উঠে বরফাবৃত গিরিশিখরসমূহ অতিক্রম করে পথ চলতে হয়। নরম বরফের স্তরে পা ডুবে যায়, প্রতিপদে পদস্খলনের আশঙ্কা এবং তার পরিণতি অনিবার্য মৃত্যু।

ধর্মশিলা নামে বিরাট এক শিলার উপর দিয়ে সুউচ্চ শিখর-নির্গতধারা এই বসুধারা বয়ে চলেছে। ভীমসেতু নামে এক বিরাট পাথরের সেতু আছে; কিন্তু সে পথ অতিক্রম করার সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই। শোনা যায় বসুধারার জল চন্দনের সুগন্ধে পূর্ণ, শরীরে দুই-এক ফোঁটার স্পর্শ পেলে শরীর স্নিগ্ধ, সুরভিময় ও পবিত্র হয়ে যায়। প্রবাদ এই, অসীম পুণ্যবল না থাকলে এই স্বর্গীয় ধারার জল স্পর্শ করা দূরে থাক্, কাছেই যাওয়া যায় না, ধারা দূরে সরে যায়।

অষ্ট বসু এখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তপস্যা-অন্তে এখান থেকেই স্বর্গারোহণ করেছিলেন।

বসুধারার কাছেই 'ব্যাসাসন' ও 'ব্যাসপুস্তক'। কথিত আছে, এক বৃহৎ কৃষ্ণ-প্রস্তরের আসনে সমাসীন হয়ে ব্যাসদেব অষ্টাদশ সংহিতা ও পুরাণাদি রচনা করেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, এখানে সমস্ত কিছু বরফে আবৃত, কিন্তু এই আসনখানিতে না কি কখনই বরফ পড়ে না। কাছেই 'ব্যাস পুস্তক'! ঠিক পুস্তকের মতই না কি একটি পর্বত যেন স্তরে স্তরে সাজানো! এর বারোমাইল দূর থেকে যে পথ গেছে—সম্ভবতঃ কৈলাস ও মানস সরোবরের দিকে—সে পথের নাম 'সত্যপথ'। কেউ কেউ বলেন পাণ্ডবেরা এ পথ দিয়েই মহাপ্রস্থান করেছিলেন, আবার কেউ বলেন কেদারনাথের পাশ দিয়েই ছিল মহাপ্রস্থানের পথ।

আজ পাণ্ডাজী (বীরেন ভট্টমশায়) আমাদের ঘরে ঘরে সমস্ত যাত্রীকে নারায়ণের প্রসাদ দিয়ে গেলেন, নারায়ণের আসল ভোগের প্রসাদ—পুরী, পলান্ন, মালপোয়া। জীবনে অনেক প্রসাদ পেয়েছি, কিন্তু এমন অমৃতাস্বাদী, এমন প্রাণহরা, সুগন্ধে ভরা প্রসাদ আর কোনও দিন ভাগ্যে ঘটে নি। দেবতাত্মা হিমালয়ে মূর্তিরূপে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন জাগ্রত নারায়ণ। নিবেদিত ভোগ তাঁর অধরস্পর্শে অমৃত হয়ে গেছে, আর সেই প্রসাদ লাভ করে স্নিগ্ধ, পবিত্র হয়ে গেল দেহ-মন-প্রাণ। মহাপ্রভু হয়ত এরকম প্রসাদকেই বলেছেন, 'ফেলালব', কৃষ্ণের অধরস্পৃষ্ট অমৃতের কণা! তাই বলেছেন, 'এ প্রসাদ যার ভাগ্যে ঘটল না তার কি কাজ? সে রসনা তো ভেক জিহ্বাসম! তার জীবনেরই বা কি সার্থকতা?

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণচরিত
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন,
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈলকেনে.
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম।

—চৈতন্যচরিতামৃত

সেই অমৃতাস্বাদা প্রসাদ গ্রহণ করলাম মাত্র, তাঁর প্রসন্নতা-প্রসাদ তো ভিক্ষা করি নি, তাঁর নামগুণ-গানে আমার রসনা তো মগ্ন হয় নি, তাই তাঁর অধরামৃতকেও দেখলামস্থূল অন্নরূপে, রসনা পরিতৃপ্ত হল স্বাদে-গন্ধে কিন্তু

জীবনে তো অমৃতের স্পর্শ পেলাম না, এই অ-মর্ত্যধামে চৈতন্যস্বরূপ জাগ্রত পরম পুরুষের দুর্লভ 'ফেলালব' গ্রহণ করেও মর্ত্যের মোহ আর গ্লানি ফেলে রেখে তাঁকে হৃদয়ে বসাতে পারলাম না!

শেষ রাত্রিতে আবার উঠেছি। আগের দিন, রাত্রি আর আজকের সারাদিন ভরেই দেখেছি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বৃষ্টিও হয়েছে মাঝে মাঝেই। ভাবলাম, এখন একবার আকাশটাকে দেখি। দোতলার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঝরোকার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি—আহা, মরি মরি! নির্মেঘ সুনীল স্বচ্ছ আকাশে উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে শারদ পূর্ণিমার চাঁদ, তাকে ঘিরে শত শত জ্যোতির্লেখা। রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত হিমালয়ের শৃঙ্গরাজী—তার মধ্যে জেগে উঠেছেন নীলকণ্ঠ পাহাড়, মাথায় শুভ্র তুষার-কিরীট, নীলকণ্ঠ ধ্যানমগ্ন মহাদেব।

এই তো দেবতাত্মা হিমালয়ের শাশ্বত রূপ! কি দেখলাম, কি দেখছি? এ কী নয়ন-ভোলানো, মনোহরণ রূপ তোমার! চৈতন্যময়ী মহাশক্তিরূপিণী উমা তোমার কন্যা, তুমি মৃন্ময় নও, তুমি চিন্ময়! তোমাকে নমস্কার! তুমি অসীম অনন্ত ব্রহ্মেরই এক বিরাট প্রকাশ।

মহাকবির সঙ্গীত কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল—

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে॥

তবু তো সব দেখা হল না। কৈলাস, মানস সরোবর, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী গোমুখী, কোথাও তো যেতে পারলাম না। সাধ্যও নেই, সামর্থ্যও নেই। সাধুদর্শন? সে কি এতই সহজ? কি সাধনা আছে যাতে ত্রিযুগের ঋষি আর মহাপুরুষের দর্শন পাব?

আমি যে ঘরে আছি, সে ঘরে আমার পাশের বিছানায় শুয়ে আছেন সেই কোমর ভাঙা বুড়ীমা আর তার মেয়ে অমিয়াদি। এক বিছানায় পা-ভাঙা আর এক বুড়ী। আর একদিকে সারদা আশ্রমের কিরণদি, তাঁরও একটি পা অসাড়। এরা ভক্ত, সাধনানিষ্ঠ। শেষ রাত্রে উঠে মঠের নিয়মানুযায়ী জপে বসেন কিরণদি; অমিয়াদিও কোমল মধুর স্বরে, সুন্দর উচ্চারণে স্তব-স্তোত্র

পাঠ করতে থাকেন। সারাদিন বাজে কথা নেই, স্তব-কীর্তন নিয়েই আছেন। অমিয়াদি সংস্কৃতে উপাধিপ্রাপ্ত, আবার বি. এ. পাশও করেছেন নিজের চেষ্টায়। স্বামী নেই, স্বামীর ব্যবসা নিজেই দেখাশোনা করেন। কিন্তু কি অনাড়ম্বর তাঁর জীবনযাত্রা, কি সুন্দর তাঁর ব্যবহার! ক'দিনই বা এক সঙ্গে রইলাম; খুবই ভাল লাগল। মাও তেমনি তেরো বছরের বালবিধবা, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে, বধূজীবন কেটেছে শ্বশুরবাড়ির কঠিন চার-দেওয়ালের মধ্যে। কাজেই বৈধব্যের যতকিছু কঠোরতা, সবই শরীরেব উপর দিয়ে বয়ে গেছে দীর্ঘকাল। কিন্তু তার জন্যে এতটুকু দুঃখ নেই, ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন নম্র নীরবতায়। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ সবই পড়া—শুধু পড়া নয় অধিগত। যখনই সময় পান, বসে বসে সে সব কাহিনী আমাদের শোনান! প্রকাশ-ভঙ্গীটিও অপূর্ব, শুনতে খুবই ভাল লাগে।

ওঁদের ডেকে তুললাম, "আসুন জেগে উঠেছেন 'নীলকণ্ঠ', তাঁকে দর্শন করুন!" শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওঁরা বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সকল ঘরের দুয়ার খুলে গেল, একে একে বাইরে এসে দাঁড়ালেন সবাই।

স্তব্ধনেত্রে তাকিয়ে রইলেন অপূর্ব-দর্শন নীলকণ্ঠের দিকে। দেখতে দেখতে পূর্ব গগনে অরুণোদয়ের রক্ত-রাঙ্গা আভাস জেগে উঠল, রজতশুভ্র নীলকণ্ঠ পাহাড়ে যেন সোনা ঢেলে দিল কেউ! তপ্তকাঞ্চন-বর্ণে ঝলমল করছে নীলকণ্ঠের উত্তুঙ্গ শিখর। কি বলে সে রূপের বর্ণনা দেব? ভাষাহীন স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু তাকিয়েই রইলাম। একে একে যেন সপ্ত রঙ-এর বর্ণালীতে রঞ্জিত হতে লাগলেন নীলকণ্ঠ! আমরা শুধু সেই রূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি, তাঁকে দিয়ে গেলাম সুরের অঞ্জলি, তাঁর আরতির শঙ্খরবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল সেই সুর!—

তাঁহারে আরত্তি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ—
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত-মন্দিরে॥
অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অসীম-মহিমা-মগন—
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে॥

—রবীন্দ্রনাথ

সত্যই শিখরে শিখরে তরঙ্গায়িত হিমালয়। একদিন হিমালয় ছিল মহাসমুদ্র। মহাকালের হস্তক্ষেপে সেই মহাসমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গগুলিই কি সহসা রূপান্তরিত হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ স্থির প্রশান্ত শৃঙ্গে?

মহাসমুদ্র অশান্ত, হিমালয় প্রশান্ত। অদ্বৈতজ্ঞানে শান্ত, সমাহিত হিমালয়। দ্বৈত লীলায় চঞ্চল সমুদ্র। হিমালয় দ্রষ্টা, সমুদ্র স্রষ্টা অথবা সৃষ্টিশীলা বিক্ষোভিতা শক্তির সঙ্গে মিলনে উদ্বেল।

প্রাণভরে তোমার স্বরূপের এতটুকু আজ দেখলাম হে মহান নগাধিরাজ। শুনেছি তুমি ভয়ঙ্করও, কিন্তু সে রুদ্ররূপ তুমি আমাদের দেখাও নি। তোমার অনন্ত উদার মহিমা, তোমার পুণ্য পবিত্র বায়ু, তোমার মনোহর সৌন্দর্যের ছবি, এই থাক্ আমার হৃদয়ে আঁকা। তুমি মহান, তুমি জগন্মাতার পিতা, তুমি শিবের ধ্যান—সমাহিত রূপ, তুমি বদরি বিশালার ভূমানন্দ, তুমি ব্রহ্মের অদ্বৈত প্রকাশ। তোমাকে প্রণাম, শত প্রণাম।

১৪ সেপ্টেম্বর, '৭৩

বিদায় নেবার পালা সমাগত। বেলা প্রায় নয়টা। বিছানা বাঁধা, বাক্স গোছান সারা হয়ে গেছে, তৎপর হয়ে উঠেছেন ম্যানেজার আর তার সহকর্মীরা, বাস প্রস্তুত।

আজ আকাশ ঘন নীল, উজ্জ্বল সূর্যালোকে উদ্ভাসিত নীলকণ্ঠ। (সত্যই শ্বেতশুভ্রতুষারে আবৃত এই পর্বতের শিখর, ঠিক যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির মত, আবার তাঁরই মত এই শিখরের কণ্ঠদেশ তুষারবিহীন নীল।)

গলিত রৌপ্যের মত ঝক্ ঝক্ করছে রোদ, মধুময় আকাশ-বাতাস, মধুময় হিমালয়ের প্রতি ধূলিকণা। আনন্দময় আমাদের হৃদয়, 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' কিন্তু তারই মাঝে বেজে উঠছে বিদায়ের বিষণ্ণ স্বর, আনন্দলোক থেকে নির্বাসনের বেদনা।

সকালবেলাতেই তপ্ত কুণ্ডে স্নান সেরে নিয়েছি। বেডিং-বাক্স সুধীরদের জিম্মা করে দিয়ে মন্দিরে গেলাম নারায়ণের চরণে শেষ প্রণাম নিবেদন করবার মানসে। এই তিনদিন তাঁর রাজবেশ পরিহিত মূর্তি দেখেছি, নিরাবরণ

অঙ্গ ভাল করে দেখতে পাই নি, অভিষেকও দেখতে পাই নি। আজ গিয়ে দেখি, মন্দির শূন্য-প্রায়, সেবকেরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ নেই, কাছে যেতেই মূল মন্দিরের দরজায় যিনি বসে থাকেন, সেই পাণ্ডা ডেকে নিয়ে বসালেন ঠাকুরের সোজাসুজি একেবারে সামনে।

দেখলাম অভিষেকের সব আয়োজন প্রস্তুত, যিনি প্রধান পূজারী, তিনিই স্নান-শৃঙ্গার, সেবা পূজা করেন। শুনলাম, ইনি শঙ্করাচার্যের বংশধর, নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ, এঁরাই নারায়ণের সেবার অধিকারী, অন্য কারও সেবা, পূজা, এমন কি নারায়ণ স্পর্শ করবারও অধিকার নেই।

বিরাট একটি পিলসুজের বড় একটি প্রদীপ জ্বলছে, তারই শিখার স্বল্প আলোকে অন্ধকার মন্দির-প্রকোষ্ঠ আলোকিত হয়ে রয়েছে। কালীপূজার পরে যখন মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হয়, তখন কয়েক সের ঘি দিয়ে এই প্রদীপটিই জ্বালিয়ে রাখা হয়, ছয় মাসের পরিমাণ পূজার উপচারে সাজান নৈবেদ্য নারায়ণের সামনে নিবেদন করে, পূজারী, সেবক সকলেই নিচে যোশীমঠে চলে যান। ছয় মাস সেখানেই বদরিজীর পূজা হয়। ছয় মাস শেষে, বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া দিনে মন্দিরের দরজা খোলা হয়। বরফাস্তীর্ণ পথ-ঘাট আর মন্দিরের বরফ কেটে কেটে দরজা খুলতে হয়। কিন্তু এই বরফের আস্তরণে ঢাকা নীরন্ধ্র মন্দিরের গর্ভগৃহে নারায়ণের সামনে প্রজ্বলিত প্রদীপ শিখাটি জ্বলতে থাকে অনির্বাণ। সেবক, দোকানী, পাণ্ডা—অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি, 'এও কি সম্ভব?' একবাক্যে তাঁরা বলেছেন 'সম্ভব', জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন কি এসে?'

'হ্যাঁ মাঈজী, দেখেছি। বাতি জ্বলবে না কেন, মানুষ প্রাণী সবাই যখন চলে যায় নিচে তখন আসেন দেবতারা, এই ছয় মাস তো তাঁরাই করেন প্রভুর পূজা, আরতি, হোম।'

বিংশ শতাব্দীর কূটতর্কজাল আর অবিশ্বাসের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন আমাদের মন, ভাবি, এও কি সম্ভব? কিন্তু বহুযুগের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সনাতন হিন্দুধর্মের অনুভূতিলব্ধ সত্যের বিন্দুমাত্র আভাসও তো রক্তে প্রবাহিত, তাই 'বিশ্বাস'কেই আঁকড়ে ধরলাম। মনে হল, যাঁর অচিন্ত্য শক্তিতে অহরহ চলেছে

এই বিশ্বলীলা, তাঁর অসাধ্য কি আছে? যে অঘটন ঘটন পটিয়সী মহামায়া তাঁর স্বরূপশক্তি, তিনিই তো উমারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এই হিমালয়ে; তাঁর ইচ্ছায় কিনা হতে পারে?

বহুশ্রুত একটি কাহিনা মনে পড়লো, পৌরাণিক যুগের নয়, এই কলিযুগেরই কাহিনী।

এক দরিদ্র গ্রাম্য বৃদ্ধ বদারনাথ দর্শনের আশায় এসেছেন ভারতের সুদূর প্রান্ত থেকে। সারা জাবনের তিল তিল সঞ্চয়টুকু সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সুচিব-সঞ্চিত একটিমাত্র কামনা পূরণের আশায়, বদবি বিশালাকে দর্শন করে জীবন সার্থক করবেন এই ছিল তাব কামনা। ন্যুব্জদেহে, কঠিন কঠোর গিরিপথ অতিক্রম করে করে চলেছেন, আপনমনের মাধুরী মিশায়ে পথের ভয়ঙ্করতাকেও কবে নিয়েছেন সুন্দর।

বহু কষ্টের পথ পার হয়ে যখন প্রায় এসে পৌঁছেছেন বদরিকাশ্রমের কাছে, তখন তিনি দেখলেন একে একে নেমে আসছেন দুই একজন যাত্রী। অবাক বিস্ময়ে তাঁরা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তিনি চলেছেন কোথায়? তাঁরা ওকে আগে জানালেন, মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে সেদিনই। শেষ যাত্রী তাঁরাই, চলেছেন ফিরে। বৃদ্ধকেও ডাকলেন তাঁরা, ফিরে যাবার জন্য তাদেব সঙ্গে; দর্শন তো হবে না।

দর্শন হবে না? এত কষ্টের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, দরজায় এসে ফিরে যেতে হবে? 'নারায়ণ, নারায়ণ! আমাকে কৃপা করো। দয়াল, আমি ফিরে যাব না, আমাকে তুমি দেখা দাও।' পরম আকুতি নিয়ে শিথিল কম্পিত চরণে বৃদ্ধ চললেন এগিয়ে, এসে দাঁড়ালেন মন্দিরের সামনে।

দরজায় তালা। চাবি হাতে পূজারী চলেছেন নিচে। বৃদ্ধকে দেখে বিস্ময়ে এগিয়ে এলেন তিনি, বললেন, 'এ কি করেছ বৃদ্ধ? জান না এই দিনে বন্ধ হয়ে যায় মন্দির দুয়ার? চল, চল আমার সঙ্গে নিচে, ছয়মাস পরে যখন মন্দির খুলব তখন এসে দর্শন কর।'

বরফে ঢেকে গেছে হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি, শুরু হয়েছে তুষারপাত, বৃদ্ধ লুটিয়ে পড়লেন মন্দিরের দরজায় অশ্রুরুদ্ধ আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠলেন, 'দুয়ার

খুলবে না, দেখা দেবে না আমায়? প্রভু, আমার সারা জীবনের আশা পূর্ণ করবে না তুমি?' পূজারী হাতে ধরে টেনে তুললেন তাঁকে, বললেন, 'কেঁদো না বাবা, চল আমার সঙ্গে; ছয়মাস পরে আমিই তোমাকে নিয়ে এসে দর্শন করাব।'

মিনতি-ব্যাকুল কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন, 'আমার তো আর শক্তি নেই চলে গিয়ে আবার ফিরে আসার, সে সাধ্য তো আমার নেই বাবা? তুমি দয়া কর এই হতভাগ্যকে, একবার দরজা খুলে দাও, আমি তাকে দেখি।'

পূজারী বললেন তিনি নিরুপায়, নারায়ণের বন্ধ দরজা এখন আর খুলবার অধিকার নেই তাঁর, তিনি নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। ছয় মাস পরে বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে খোলা হবে মন্দির, এর ব্যতিক্রম করবার সাধ্য তাঁর নেই।

নিষ্ফল হল বৃদ্ধের কাকুতি, দরজা খুলল না। নিষ্ফল হল পূজারীর চেষ্টা, বৃদ্ধও গেলেন না। অবশেষে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে বৃদ্ধকে রেখেই পূজারী চলে গেলেন নিচে।

বৃদ্ধ এবার এগিয়ে চললেন পর্বতের এক কিনারায় অলকানন্দার তীরে। কি হবে আর এই ব্যর্থ জীবন রেখে? ভৃগুপতনে দেহত্যাগ করবেন তিনি। স্থিরসঙ্কল্প বৃদ্ধ ডাকলেন অন্তিমের ডাক, 'হে নারায়ণ, প্রভু! তোমার কৃপা পেলাম না, হলাম চিরবঞ্চিত। তাই হোক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' দেহ প্রস্তুত, মন প্রস্তুত, প্রাণারামের অদর্শনে প্রাণও প্রস্তুত, মৃত্যুই একমাত্র কাম্য। লাফ দেবেন—হঠাৎ দূরাগত এক কিশোর কণ্ঠের ধ্বনি বেজে উঠল কানে, 'হো বুড়ঢা' বৃদ্ধ ফিরে তাকালেন, পার্বত্য ঘোড়ায় চড়ে আসছে এক কিশোর, দূর থেকে হাতের ইশারায় কি যেন বলতে চাইছে। দ্রুত কাছে এসে দাঁড়াল সে অশ্বারোহী, প্রাণচঞ্চল এক পার্বত্য কিশোর! বলল, 'কি করতে যাচ্ছিলে তুমি? এখানে একা একা কি করছ?'

আর্তরবে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ, 'কেন পেছু ডাকলে বাবা, কেন বাধা দিলে আমার কাজে?'

'পাহাড়ের ধারে, খাদের কিনারায় কি তোমার কাজ? অত ঝুঁকেছিলে কেন? আর একটু হলেই তো পড়ে মরতে।'

'মৃত্যুই তো আমার প্রয়োজন বাবা। এ ব্যর্থ জীবন রেখে আমার কি লাভ?'

'আরে বুড়ো মরবে তো কদিন পরেই, তা এত ব্যস্ত কেন? বলো না শুনি কি হয়েছে, কি তোমার দুঃখ।'

'তোমাকে বলে আর কি হবে বাবা। যাকে বলে এলাম সারাজীবন, কই তিনি তো শুনলেন না।'

'আচ্ছা আমাকে একবার বলই না, বলে দেখ না কিছু করতে পারি কি না?' কান্না-জড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধ যখন তাঁর বেদনার কাহিনী বললেন তখন হেসে উঠল কিশোর, 'এই কথা? এর জন্যে তোমার এত দুঃখ, তাই বুঝি গিয়েছিলে মরতে? আর দুঃখ কর না, কালই দর্শন পাবে তুমি।'

'সেকি, পূজারী যা করতে পারলেন না, তুমি কেমন করে তা করবে বাবা?' 'আরে বুড়ো আমি এখানকার সর্দারের ছেলে। আমাদের নিয়মইতো নিয়ম। এসো তো আমার সঙ্গে এই গুহায়, যা তুষারপাত হচ্ছে, জমে যাবো যে।'

সুন্দর সুপ্রশস্ত এক গুহায় বৃদ্ধকে নিয়ে ঢুকল কিশোর বালক, ঘোড়াটাকেও রাখল একধারে, বলল, 'কি করবো শুধু বসে বসে, এক দান দাবা খেলা যাক, কি বল?'

কোথা থেকে সে বের করল দাবার ছক আর ঘুঁটি, বৃদ্ধকে নিয়ে বসে গেল খেলতে। তার গায়ে শুধু একটা জামা, চাদর-কম্বল কিছুই নেই, কাঁপছে শীতে।

বৃদ্ধের বড় মায়া হল, নিজের গায়ের ছেঁড়া কম্বল আছে একটা, ময়লা চাদরও রয়েছে একটা, ছেলেটির গায়ে চাদরটি জড়িয়ে দিল।

ধীরে ধীরে খেলা জমে উঠেছে; তারপর কোথা দিয়ে যে সারারাত কেটে গেছে তা টেরও পেল না বৃদ্ধ।

এক সময় ভোরের আলো গুহায় প্রবেশ করল। উঠে কিশোর বলল, 'যাও বুড়ো, মন্দিরে গিয়ে বস, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই পূজারীকে পাঠিয়ে

দিচ্ছি। মন্দির খুলবে, প্রাণভরে দর্শন করবে তুমি। দেখো, আবার মরতে যেও না যেন।' ঘোড়া ছুটিয়ে সে মিলিয়ে গেল তুষারাচ্ছন্ন দিগন্তে।

বৃদ্ধ ভাবলেন, কি সুন্দর কিশোর বালক, কি মিষ্টি তার কথা! কোথা থেকে এসে দিয়ে গেল বুকভরা আশ্বাস আর সান্ত্বনা। সত্যি কি আসবেন পূজারী, খুলবেন দরজা, দর্শন হবে নারায়ণ? তিনি ধীর পায়ে উপস্থিত হলেন মন্দিরের সামনে; বসলেন সেখানে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল দূর থেকে উঠে আসছেন সেই হৃদয়হীন পূজারী—এত সাধ্য-সাধনা, এত কান্নায়ও কাল যাঁর মন গলে নি, আজ তিনিই আসছেন নিয়মভঙ্গ করে দরজা খুলতে? সমুখে এলেন পূজারী, দেখলেন মন্দিরের সামনে বসে আছেন সেই বৃদ্ধ, যাঁকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন মৃত্যুর রাজ্যে।

তিনি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, একি? তুমি বেঁচে আছ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? একি অসম্ভব ঘটনা? এই বরফের মধ্যে কোথায়, কেমন করে তুমি কাটালে এই দীর্ঘ ছয় মাস?

'ছয় মাস? কি বলছ তুমি ব্রাহ্মণ? গতকাল মাত্র তুমি চলে গেলে, এত কাঁদলাম, তবু একটিবার দরজা খুলে দিলে না, মরতেই তো গিয়েছিলাম। কত ভাগ্যে এল সর্দারের ছেলেটি, আমাকে নিয়ে সারারাত দাবা খেলল। আজই সকালে গিয়ে পাঠিয়ে দিল তোমাকে মন্দিরের দরজা খুলতে। আর তুমি বলছ ছয় মাস?'

'মাত্র গতকাল? পাহাড়ী সর্দারের ছেলে? সে কি, কে সে? কি বলছ তুমি? আবার বল বৃদ্ধ আবার বল; জানো, আজ কি মাস, কোন্ তিথি? তুমি এসেছিলে কার্তিক মাসে, আর আজ বৈশাখ মাস, অক্ষয় তৃতীয়া তিথি।'

বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন পূজারীর দিকে। কি বলছেন ইনি? ছয় মাস? এক রাত্রি নয়? তবে কে সে, কে সে, দুইজনে একই সঙ্গে বলে উঠলেন, কে সে?'

বৃদ্ধের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন পূজারী, 'স্বয়ং নারায়ণ এসেছিলেন তোমার কাছে, কেন তাঁকে তুমি ধরে রাখলে না বৃদ্ধ, কেন তাঁকে যেতে দিলে তুমি?'

তুষারাস্তীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে আর্তক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ, 'এত কৃপা, এই অধমের প্রতি এত তোমার করুণা ? দেখা দিলে কিন্তু বুঝতে দিলে না কেন প্রভু ? কেন এ বঞ্চনা দয়াল ?'

মন্দিরের দরজা খুলল। দীপাধারে জ্বলছে দীপশিখা বেদিকার উপরে সমাসীন রত্নালঙ্কার-বিভূষিত বদরিনারায়ণ—নয়নে করুণা, আননে প্রসন্নতার হাসি। অঙ্গে বৃদ্ধের অর্পিত সেই ছিন্ন মলিন চাদর !

আজ বিদায়লগ্নে আমিও তাকিয়ে আছি নারায়ণের দিকে। সামনে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সাজান। রূপার পাঁচটি কলসিপূর্ণ সুবাসিত তীর্থবারি, চন্দন, আতর, ফুল, প্রদীপ জ্বলছে, ধূপের গন্ধে সুরভিত চারিদিক। প্রধান পুরোহিত, সেই সুন্দর নম্বূদ্রী ব্রাহ্মণ (রাওল) সর্ব আভরণ-আবরণ উন্মোচিত করে বিগ্রহের অঙ্গ তীর্থবারিতে অভিষিক্ত করছেন, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন ধীর উদাত্ত কণ্ঠে—দক্ষিণী উচ্চারণ, দক্ষিণী সুর। সুন্দর পবিত্র পরিবেশ, গম্‌গম করছে চতুর্দিক। এক একবার শ্রীঅঙ্গে আতর চন্দন আরও কি যেন মাখান হচ্ছে, আবার মন্ত্রপূত সুগন্ধি বারিতে ধোয়ান হচ্ছে সেই অনুলেপন। সেবক সেই প্রসাদী আতর একটুখানি এনে দিলেন হাতে, মাথায় তুলে নিলাম। অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছি—এখন সর্ব আবরণ-আভরণ-মুক্ত নারায়ণের অঙ্গ যেন ধ্যান-সমাসীন বুদ্ধদেবের মত। দুইটি হাত প্রকট, কিন্তু অপর হাত দুইটি ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না, মুখও খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু যতই অভিষেক হচ্ছে ততই যেন রূপান্তর গ্রহণ করে চলছেন নারায়ণ। কালো পাথরের মূর্তি—উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, তাঁর অঙ্গের কাঞ্চনবর্ণের আভায় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল মন্দির। নির্বাক তন্ময় হয়ে সেই অরূপের রূপের খেলা দেখছি, লক্ষ্য করি নি কখন অমিয়াদিও এসে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে, চেয়ে আছেন অপলক নয়নে।

এই তিনদিন শুধু দেখেছি তাঁর রাজবেশ, তাঁর শৃঙ্গার, কিন্তু অভিষেক তো দেখি নি, দেখি নি তাঁর নিরাবরণ জ্যোতির্ময় অঙ্গ। এই কি বৈকুণ্ঠধাম ? তাঁর আসনতলের ধূলায় লুটিয়ে পড়লাম আমরা দুইজনে, পাবনধারা নেই অশ্রুজলের, আছে শুধু দুই-একটি বিন্দু, তাই নিবেদন করে গেলাম তোমার

চরণে, হে দীন-শরণ, হে ভুবনমোহন, কৃপা কর, অসীম তোমার করুণা, তাই টেনে এনেছ তোমার এই দুর্গম তীর্থে। জীবনের সাধ পূর্ণ হল, কিন্তু তোমার পূর্ণ দর্শন তো পেলাম না প্রভু? তবু যা দিলে সেই তো আমার পরশরতন, আমার পরমধন। আমার সকল দীনতা, সকল ম্লানতা ক্ষমা করে তোমার রূপের আলোয় ভরে দিলে আমার মলিন হৃদয়, হে নারায়ণ!

আলো যে যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পূব গগনে সোনার রেখা।
কারে ওই যায়গো দেখা,
হৃদয়ের সাগর তীরে দাঁড়ায় একা,
ওরে তুই সকল ভুলে চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে—
নীরবে চরণমূলে মাথা ঠেকা॥

—রবীন্দ্রনাথ

তোমার এই করুণা থাক আমার বাকি জীবনের পাথেয় হয়ে। তুমি বদরি বিশালা, তুমি বিরাট, তুমি অসীম, তবু তুমি যে ধরা দিয়েছ আমার বন্ধনে, তাই দেখে গেলাম এখানে এসে। এই অভ্রভেদী বিশাল হিমালয়ের তুষারশুভ্রশৃঙ্গে তোমারই দীপ্ত জ্যোতির্লেখা বিকীর্ণ হয়ে আছে, স্পর্শ করে গেলাম তাঁকেও। প্রণাম তোমায়, গ্রহণ কর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ প্রণাম, অক্ষম মর্ত্যদেহের এই শেষ প্রণাম।

কেদারের পথে

বদরিনাথ থেকে লোক পাঠানো হয়েছিল কেদারনাথের পথের খবর নিতে। ছড়িদার এসেছে শুভ খবর নিয়ে—পথ ঠিক হয়ে গেছে।

এবার যাত্রা। 'জয় বদরি-বিশালা কি জয়' ধ্বনি দিয়ে যাত্রীরা বাস্-এ উঠলেন। বাস ছাড়ল—'জয় বাবা কেদারনাথজী কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হল আকাশ-বাতাস। আরও দুর্গম পথে এবার যাত্রা। 'আমাদের যাত্রা হল শুরু, ওগো কর্ণধার।' দুস্তর দুর্গম পথ উত্তীর্ণ করে নিয়ে চল আমাদের কাম্য স্থানে, তোমার দ্বারপ্রান্তে। আজ চড়াই কম, কেবল উৎরাই। অত্যন্ত ঢালু

পথে নেমে চলেছে গাড়ি মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে, যান্ত্রিক বেগকেও বোধ করি, ঐ টানের কাছে হার মানতে হচ্ছে। অনেক উঁচুতে বাস চলেছে—কয়েকশ' ফিট নিচে দেখা যাচ্ছে সঙ্কীর্ণ এক-একটি পথরেখা যেন পায়ে চলার ক্ষীণ শীর্ণ পথ। কিন্তু বাঁক ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ পরে সেই পথেই এসে পৌঁছে গেলাম আমরা, একই পর্বতশৃঙ্গ পরিক্রমা করে করে যেন একই জায়গায় ঘুরছি বলে মনে হচ্ছে। আবার আরও নিচে দেখা যাচ্ছে তেমনি একটি পথ। কখনও উঠছি কখনও নামছি। আজ রৌদ্রালোকিত পথ, বৃষ্টি নেই—তাই পাহাড়ের পথও অনেকটাই নিরাপদ। কিন্তু সামনে অর্থাৎ বারো মাইল দূরে হনুমান চটি—আর সেই পথেই সেই রুদ্ররূপী ভীষণ প্রবাহ। গাড়ি এগিয়ে চলেছে—কোথাও ধবল প্রস্তরের শ্বেত শৃঙ্গ কোথাও পীতাভ, কোথাও নীল, কোথাও ধূসর কোথাও আবার সবুজের সমারোহ। আশঙ্কাজনক ভাবে এক-একটি বিশাল প্রস্তরস্তূপ (R) ঝুঁকে আছে পথের ধারে, বিরাট বিরাট পাথর ছাতের মত দাঁড়িয়ে আছে—তার নিচেই গা ঘেঁসে চলেছে বাস -এর একটি পাথর যদি স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে বাসের উপর, তা হলে? এগিয়ে আসছে সেই ভয়াবহ প্রবাহ দূর থেকেই শোনা যাচ্ছে তার ভৈরব গর্জন। আবার এসে পড়লাম তার সামনে—সমস্ত পাহাড়টায় শত শত ফাটল, আর সেই সমস্ত ফাটল দিয়েই দুরন্ত বেগে নেমে আসছে সহস্রধারা—পাহাড়টি যেন কঠিন প্রস্তরময় নয়—অফুরন্ত জলের একটি বিরাট আধার। পাহাড়ের গায়ে পাথরগুলি ভেজা, পিচ্ছিল। পথেও পড়ে আছে সহস্র সহস্র পাথর—মিলিটারি ও স্থানীয় লোকেরা কোনও মতে পথটা মেরামত করে দিচ্ছে। আবার আমরা বাস থেকে নেমে গেলাম, অতি সন্তর্পণে পার হয়ে এলাম সেই প্রবাহ। মহাবীর হনুমান একলাফে করেছিলেন সাগর-লঙ্ঘন, আর হনুমান চটিতে যাবার পথে আমাদেরও করতে হল খরস্রোতা প্রবাহ-লঙ্ঘন। কলিযুগের মানুষের পক্ষে এইতো বেশি। মোটরে চলেছি, হনুমান চটি পৌঁছে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই, এত বড় মহাবীরের নামে এতটুকু একটি মন্দির। তাতে প্রতিষ্ঠিত তাঁরই এক ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি। মুখ দেখা যায় না, অজস্র সিঁদুর লিপ্ত, বাংলা দেশের বাইরে সর্বত্রই দেখি হনুমানজীর এই বিড়ম্বনা।

শোনা যায়, এই হনুমান চটির কাছেই সহস্র সহস্র বৎসর আগে মহারাজ মরুত্ত এক বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর দানে-প্রদত্ত সুবর্ণ-ভার বহনে অক্ষম ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক ও যাচকরা যে অতিরিক্ত সুবর্ণ পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, ব্যাসদেবের নির্দেশে সেই সুবর্ণরাশি এনেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিপুল ব্যয় নির্বাহ হয়েছিল। এখনও নাকি মাটি খনন করলে সেই যজ্ঞের অঙ্গাররাশি দেখতে পাওয়া যায়।

হনুমানজীকে প্রণাম করে এবার অপেক্ষাকৃত কম দুর্গম পথে বন্দা হলাম।

যোশীমঠ

বদরিনাথে যাবার সময়ে শুধু যোশীমঠের মাটি স্পর্শ করে গিয়েছিলাম—এবার আমাদের নামতে অনুমতি দেওয়া হল। একটি ছোটখাট চড়াই অতিক্রম করে যোশীমঠে যেতে হয় আবার দুই মাইল উৎরাই অতিক্রম করে যেতে হয় নৃসিংহ মঠে। ম্যানেজার আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কে কোথায় যেতে চাই। আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেলাম। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত যোশীমঠ দেখার সুযোগ আমি ত্যাগ করতে পারলাম না।

পরমজ্ঞানী অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত এই মঠ দর্শন করবার আশায় আমরা দুই-তিন দল লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে চড়াই উত্তীর্ণ হলাম। সুন্দর পবিত্র পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত আচার্য শঙ্করের এই সুবিখ্যাত 'জ্যোতির্মঠ' চারদিকে গোলাপ আর বহুবিধ ফুল-ফলের গাছ—সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত। আপেলের গাছে ঝুলে আছে কাঁচা-পাকা আপেল—দেখে দেখে রসনা 'রসায়িত' হয়ে উঠল।

মন্দিরে কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, সাধু ব্রহ্মচারী আছেন কয়েকজন। দোতলায় মন্দির, শঙ্করাচার্য ও তাঁর পরবর্তী কয়েকজন শঙ্করাচার্যের ফটোও আছে কয়েকটি—তাঁদেরও নিত্যপূজা হয়।

শীতের ছয় মাস নারায়ণের প্রতিভূ-মূর্তির পূজা এই মঠেই হয়। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে আমরা এখানে কিছুক্ষণ বসে রইলাম এখানে দণ্ড ধারায় স্নান করতে হয়।

যোশীমঠের অনতিদূরে সরকারি রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে কয়েক মাইল দূরে নীতি-পাশ। এ নীতি-পাশ দিয়ে কৈলাস ও মানস সরোবরে যাবার একটি পথ আছে। তিব্বত হ'য়ে সেই পরম তীর্থে যেতে হয়—ভীষণ দুর্গম সে পথ। সাধারণ মানুষের পক্ষে কৈলাস ও 'মানস' দর্শন খুবই দুঃসাধ্য—কিন্তু 'সাধ্য বস্তু' যিনি তিনি যদি উত্তীর্ণ করে দেন, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারেন। সমস্ত দুঃখকে বরণ করে নিয়ে, সমস্ত ভয়কে জয় করে, সমস্ত বিপদবাধা ও প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন পৌঁছাতে পেরেছেন কৈলাস শিখরে—আর মানস সরোবরের তীরে—তাঁরাই হয়েছেন সার্থক। নয়নাভিরাম, সে রূপলোকে তাঁরাই পেয়েছেন অপরূপের দর্শন। মঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিচে নেমে এলাম। যোশীমঠ ছোটখাটো একটি শহর, সদাব্রত, হাসপাতাল, পোষ্টাফিস বাজার—সবই এখানে আছে।

যাঁরা নৃসিংহ মন্দিরে গিয়েছিলেন তাঁরাও আস্তে আস্তে ফিরে এলেন। শুনলাম নৃসিংহ দেবের একটি হাত ক্রমশঃ সরু হয়ে যাচ্ছে। প্রবাদ এই, যে দিন এই হাতটি তাঁর অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সেদিনই হবে কলির শেষ। বদরিনাথজীর বর্তমান মন্দির বা তীর্থও তখন থাকবে না, নর-নারায়ণ পর্বত দুইটি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে চিররুদ্ধ করে দেবে বদরিনাথের পথ। যোশীমঠ থেকে কিছু দূরেই নাকি স্বয়ংসৃষ্ট ভবিষ্যবদরি আছেন। কলির শেষে বর্তমান বদরিনাথ গুপ্ত হয়ে গেলে এবং সেই তীর্থপথ লুপ্ত হয়ে গেলে—ভবিষ্যবদরিনাথজাই প্রকটিত হবেন নতুন স্থানে। একথা শুনে পর্যন্ত ভবিষ্যবদরি দর্শন করবার আশায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠল—কিন্তু আমরা কুণ্ডু স্পেশ্যালের নিয়ন্ত্রণাধীন—তাই চুপ করেই রইলাম। যাঁর চরণ দর্শন করে যুগ যুগ ধরে সহস্র সহস্র তৃষিত ভক্ত ধন্য হয়েছেন—যাঁকে দর্শন করবার আশায় দুঃসহ কষ্টকে তুচ্ছ করে চলেছেন লক্ষ লক্ষ দুর্বল অসহায় মানুষ—তিনি অপ্রকটিত হয়ে লোকের চোখের আড়ালে সরে যাবেন—ভাবতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়—নর-নারায়ণ পর্বত পরস্পর সংলগ্ন হয়ে যাবেন কল্পনা করতেই জাগে বিস্ময় আর আতঙ্কের শিহরণ।

কিছুক্ষণ পরেই পাণ্ডুকেশ্বর। প্রবাদ আছে যুধিষ্ঠিরের পিতা পাণ্ডুরাজা

এখানে মৃগভ্রমে মুনিপুত্রের প্রাণ বধ করেছিলেন। পরে অনুতপ্ত চিত্তে তিনি দীর্ঘকাল গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা করে পুত্র বরলাভ করেছিলেন। এইস্থানে পঞ্চ পাণ্ডব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি আছে। এসব অবশ্যই আমাদের দেখা হল না। তারপর বিষ্ণুপ্রয়াগ। পথে চা ও অন্যান্য খাবার খাওয়া হল। এবারও বাসে বসবার সেই পূর্বের ব্যবস্থা। আজ মাথাটা বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় নেই, একটু হেলান দেওয়া দরকার, তাই কোণের দিকে একধারে বসেছিলাম--ম্যানেজারও বারণ করেন নি। কিন্তু যারা দলে ভারী, যাঁদের মুখের কথার তীক্ষ্ণতা বেশি তাঁরা আমাকে বসতে দেবেন কেন? উঠলাম, কিন্তু আমার পূর্ব সীটেও আর জায়গা পেলাম না। মালদার বোনঝির সেই মাসি বসেছেন গ্যাট হয়ে। বড় বড় পার্টির সঙ্গে টিকতে পারেন নি। কাজেই ঝালটা ঝাড়লেন আমার উপরে। আমার জলের বোতলটা পা দিয়ে ঠেলে --আমাকে কনুই-এর গুঁতো দিয়েও বাগ গেল না, পড়লেন 'জলি পার্টি'র শান্ত সরল মঞ্জুদিকে নিয়ে। তার মুখের তোড়ে আমি তো কোন্ ছার, 'জলি পার্টি'ও একেবারে যেন চুপ্‌সে গেলেন। বেচারা বোনঝি অনেক কষ্টে মাসীকে শান্ত করল। সেই কবিও আছেন আমার সামনে—সেই উদাস দৃষ্টি, কণ্ঠে গুন্ গুন্ গান, গায়ে গোটাদশেক জামা। বদরিনারায়ণে এই তিনদিন তাকে বিশেষ দেখতে পাই নি, কিসের সন্ধানে কোথায় ঘুরছিলেন কে জানে?

কর্ণপ্রয়াগে আসতে আসতে দুপুর পার হয়ে গেল। চলেছি পিপুলকোটি চটির পথে। এ পথ তো এখন আমাদের জানা। সেই পুষ্পবাটিকা (Valley of flowers) পার হয়ে এলাম। পথের ধারে খাদের কিনারায়, কোনও কোনও শৃঙ্গে ফুটে আছে নানা রং-এর অজস্র ফুল। ঝর্ণা ঝরছে, অলকানন্দা বয়ে চলেছেন সগর্জনে, তার উপর মাঝে মাঝে 'রোপওয়ে' দিয়ে খাঁচায় করে পার হচ্ছেন কেউ। কোথাও দাঁড়িয়ে আছে নাঙ্গা পাহাড়, কোথাও ঘন তৃণাচ্ছাদিত শৃঙ্গ —কোথাও চুণা পাহাড়ের শুভ্রতা।

দূরে দূরে মাঝে মাঝে অলকানন্দার অপর পারে পাহাড়ের গায়ে গায়ে দেখা যাচ্ছে হরিৎক্ষেত্র, কোথাও ছবির মত এক একটি গ্রাম। রাস্তায় জনমানব

নেই—কেবল কোনও চটির কাছাকাছি এলেই দেখা যায় কয়েকজন মানুষ, দোকান বাজারও দেখা যায় কিছু কিছু।

আমরা নেমেই চলেছি। আজ আবার চড়াইও উঠতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। বিকাল হয়ে এল—পিপুলকোটি চটি এখনও বহুদূর। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় নেমে আসছে কালো ছায়া, সন্ধ্যা হয়ে গেলে এই সঙ্কীর্ণ বিপদসঙ্কুল পথে কেমন করে চলবে গাড়ি কিছুই জানি না।

এসেছি গাড়িতে—পায়ে হেঁটে আসি নি তাই হাঁটার শ্রম নেই, নেই শ্রম ক্লান্তি। কিছু পথের সঙ্কট আর বিপদ দেখে দেখে ভাবি, যারা পায়ে হেঁটে আসতেন তাঁরা দুঃসহ কষ্ট করতেন সত্যই, কিন্তু পদে পদে এত ভয়, আতঙ্ক তাঁদের ছিল না। যন্ত্রযানে এসে আরাম যত, ভয়ও তার চেয়ে কম নয়

সন্ধ্যা হয়ে এল—অন্ধকার নেমে এসে ঘিরে ধরছে আমাদের আর কতক্ষণ?

না, আর দেরী নেই। আমরা এসে পড়েছি আলোর সীমানায়—ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে পিপুলকোটি চটির আলোর ইশারা।

বাস থেকে নেমে আগের নির্দিষ্ট ঘরগুলিতে আমাদের অস্থায়ী আশ্রয় পাতা হল। শীতের রাজ্য থেকে এখানে এসে একটু যেন গরমই বোধ হচ্ছিল। আজ সবাই কলমুখর, শহরের হাওয়া গায়ে লেগেছে ঘরোয়া কথা, হাসি ঠাট্টা চলছে, বুড়োদের আড্ডাও জমে উঠেছে বেশ।

খাওয়া শেষ হতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজল, ঘুমিয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যেই।

১৫ সেপ্টেম্বর, '৭৩

ভোর রাত্রি তিনটা থেকেই যাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে গেল সেই স্নান-ঘরের সামনে লম্বা সারি, শেষ হতে ভোর পাঁচটা বেজে গেল। চা আর সামান্য জল খাবার খেয়েই 'চলো মুসাফির, বাঁধো গাঁঠরি'। রাত্রে একবার করে বিছানাপত্র খোলা, আবার পরদিন সকালে তা-ই বাঁধাছাঁদা। পান যা নিয়ে এসেছিলাম, সংখ্যায় কমে এসেছে। বদরিজীর পথে পথে এমন কি

বদরিকাধামেও পান পাওয়া যায়। পানের খিলি একটা পনেরো পয়সা, গোটা পানও আছে,—তবে সবই ছাঁচিপান। পিপুলকোটি থেকেও কিছু কিনে নিলাম, পান না থাকলে তীর্থভ্রমণ আমার ভ্রমেই পরিণত হবে, চোখে দেখব শুধু মায়া মরীচিকা।

'জয় বাবা কেদারনাথ' ধ্বনি দিয়ে গাড়িতে উঠলাম। সেই বোনঝির মাসি আজ মঙ্গুদিকে নিয়ে পড়লেন, 'কেনে তোমরা ইধারে বইসবেক, তুমাদের এত জোর কেনে, আমার লোকে পয়সা দিলেক নাই?' ধাক্কা মেরে জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে জায়গা করে বসে তবে ছাড়লেন। নিরীহ মঙ্গুদি নীরবে সরে গেলেন একপাশে। কিন্তু আমার ললাট-লিখন 'যথাপূর্বং তথাপরং'। আর এক প্রায়-বৃদ্ধা মহিলা বসেছেন আমার পাশে ঘুমে ঢুলছেন আর পড়ছেন আমার গায়ে।

দুপুরে পুনরায় এলাম রুদ্রপ্রয়াগে। সুন্দর একটি উপত্যকা। ভাল মিষ্টি-পুরী-চায়ের দোকান আছে কয়েকটি। খুব বড় বড় শশা বিক্রি হচ্ছে, আপেলও রয়েছে প্রচুর। এই অঞ্চলের আপেল মিষ্টি কম, দামে সস্তা। একটা দোকানে গিয়ে আজ একটু দুধ নিলাম। বেশ ভাল দুধ, এক গ্লাস আট আনা। এখানে কুণ্ডু স্পেশ্যাল আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। খাওয়াব পরে বেলা প্রায় দুইটায় রুদ্রপ্রয়াগের টানেল পার হয়ে রওনা হলাম কেদারনাথেব পথে। এখানেই পথ দুভাগ হয়ে গেছে--একটি পথ বদরিনাথের দিকে, আর এক পথ কেদারনাথের দিকে। অথচ কেদার-শৃঙ্গ আর বদরিশৃঙ্গের দূরত্ব মাত্র চার পাঁচ মাইল। কিন্তু সে পথ অবরুদ্ধ। নীলকণ্ঠ পর্বত তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে — তাঁকে উল্লঙ্ঘন করে হাঁটা-পথে যাওয়া অসম্ভব—বাস চলা তো দূরের কথা। কত প্রবাদ, পৌরাণিক, লৌকিক, ঐতিহাসিক কাহিনী এক-একটি তীর্থকে কেন্দ্র করে, প্রচলিত হয়ে আসছে! এমনই একটি কাহিনীতে কথিত আছে কেদারনাথ আর বদরিনারায়ণের পূজা করতেন একই পূজারী। দুই শৃঙ্গের মধ্যে মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধান, মাঝের পথেও তেমন দুস্তর বাধা ছিল না, ছিল না সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। তাই আগে খুব সম্ভবতঃ কেদারনাথের পূজা

সেরে ঐ চার-পাঁচ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেই পূজারী বদরিনারায়ণের পূজা করতেন। পাহাড়ের শুচিশুদ্ধ দেহী অধিবাসী পুরোহিতের কাছে এই চড়াই-উৎরাই-এর পথ অতিক্রম করা খুব কঠিন মনে হত না। এক মন্দিরে পূজা সমাপন করে দেবতার প্রসাদটুকু উত্তরীয়প্রান্তে বেঁধে নিয়ে চলে আসতেন আর এক দেবতার কাছে। এই পূজা-সমাপনান্তে দুই মন্দিরে দেবতার প্রসাদ এক সঙ্গে গ্রহণ করতেন।

একদিন এক পূজা শেষ করে পুরোহিত যখন পথ অতিক্রম করছিলেন দ্বিতীয় মন্দিরের উদ্দেশ্যে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। এর আগে এমন তো হয় নি। হয়তো পাহাড়ে সেদিন সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ছিল। হয়তো বা তাঁর শরীরও খুব সুস্থ ছিল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়নায় পুরোহিত উত্তরীয়প্রান্ত খুলে একটু প্রসাদ মুখে দিলেন, পাহাড়ের গায়ে গায়ে নির্মল জলধারার তো অভাব নেই—অঞ্জলি পুরে জলপান করলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর পথশ্রম দূর হল। শান্ত-তৃপ্ত চিত্তে পুরোহিত এলেন দ্বিতীয় মন্দিরে, পূজাও সমাপ্ত করলেন। এবার ফিরে যাবেন, কিন্তু পথের পানে চেয়ে দেখেন গগন ছুঁয়ে মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে এক উচ্চশৃঙ্গ পর্বত। এ কি স্বপ্ন, না চোখের ভ্রম? বিস্মিত ব্রাহ্মণ চোখ মুছে আবার তাকালেন, এগিয়ে গেলেন সেই পর্বতেব কাছে তাব গা ছুঁযে দেখলেন। না ভুল নয়, সত্যই তাঁর নিত্যচলার পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে এক বিশাল পর্বত! এরই নাম কি নীলকণ্ঠ?

তারপব থেকেই দুই ধামে দুই পূজারী। রুদ্রপ্রযাগ থেকেই শুরু হল ওয়ান ওযে (one way)। কেদারেব দুর্গমতর পথ—এপথ বদরির পথের মত নয়। বদবিব পথঘাট সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে, কাজেই সে পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। কেদারের পথ সি এন্. বি. (C. N. B)-র তদাবকিতে। ফলে, সেখানকার ব্যবস্থা এবং রাস্তা দুটোই কাঁচা।

রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম। অলকানন্দা এসেছেন কৈলাসনাথের চরণ থেকে। দুই পুণ্য নদীর সঙ্গমে সে কী ভীষণ প্রবাহ—কী কর্ণবিদারী গর্জন! এই সঙ্গমে স্নান করা দুঃসাধ্য। এখান থেকেই মন্দাকিনীর তীর ধরে ধরে কেদারনাথে যাবার রাস্তা। অলকানন্দাকে বিদায় দিয়ে

এখন আমরা চললাম মন্দাকিনীর পাশে পাশে হাজার হাজার বছর আগে কে এই নদীগুলির নাম রেখেছিলেন? অলকানন্দা, মন্দাকিনী, জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী, স্বর্গারোহিণী—কী সব সুন্দর আর মধুর কাব্যময় নাম। আদি কবি বাল্মীকিরও আদিতে কে ছিলেন সেই মহাকবি? অদ্বৈত-জ্ঞানের, ব্রহ্মানুভূতির পরেও কি হিমালয়ের রূপের আকর্ষণে তিনি মহাসমাধির পার থেকে জেগে উঠেছিলেন? সীমার মধ্যে অসীমকে রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কি সেই মহাসাধক মহাকবি?

যতই উঠছি, দেখছি রাস্তার রাস্তায় ধসের চিহ্ন। খাদের দিকে পথ অনেকটাই ধসে গেছে স্থানীয় লোকজন ধসগুলি সামান্য সামান্য ঠিক করে দিচ্ছে বটে, কিন্তু চেয়ে থাকলে বুক কেঁপে উঠে 'এই বুঝি ভাঙল পথ, এই বুঝি পড়ল গাড়ি অতলে।

পথে কোথায় যেন মহাতপ অগস্ত্য মুনির মন্দির আছে। কিন্তু আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হল না। আমরা চলেছি গুপ্তকাশীর দিকে। পথে মাঝে মাঝে কোন চটির কাছে নেমেছি—ঝর্ণা আছে সঙ্গে সঙ্গে। চা, খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে—বোতলে ঝর্ণার সুস্বাদু মিষ্টি জল ভরে নিয়েছি।

গুপ্তকাশীর পথে ভীষণ চড়াই আমাদের অবশ্যই পায়ে হেঁটে উঠতে হচ্ছে না, চড়াইয়ের পথ-কষ্টে তাই বুকও ঠক ঠক করে কাঁপছে না। কিন্তু রাস্তার ভীষণতা দেখে, আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে সকলের চোখমুখ। আজ পথের মাঝ থেকে আমাদের সঙ্গী হয়েছে অল্প বয়সী, সাহসে সমুজ্জ্বল দুই তিনটি যুবক ওরা হেঁটে হেঁটে 'গঙ্গোত্রী', 'যমুনোত্রী'র তীর্থ করে এসেছে। ভয়ঙ্কর দুর্গম গোমুখীতেও ওদের যাবার ইচ্ছা। কেদারনাথ একজনের একবার দর্শন হয়েছে আবার সঙ্গীদের সঙ্গে আজ চলেছে কেদারের পথে। ওরাই বলল, বদরির পথে পুষ্পবাটিকায় (V llc c1 o১.1) কটা ফুল দেখেছেন আপনারা? আমরা হেঁটে হেঁটে ঐ কুসুমাস্তীর্ণ উপত্যকার ভিতরে গিয়েছিলাম। লক্ষ লক্ষ ফুল ফুটে আছে—কত রং, কত না সে স্বভাবজ কাননের শোভা! শুনেছি নন্দনকাননের কথা, মনে হয় নন্দনকাননের সৌন্দর্যকে হার মানিয়েছে এই উপত্যকা।

যমুনোত্রীর দুর্গম কঠোর পথও উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে ওরা, দেখেছে যমুনার উত্তরণ-ক্ষেত্র। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ওদের একজন পথ হারিয়ে ফেলেছিল, অজানা অচেনা পথঘাট—সমুখে ভয়ঙ্কর রাত্রি—আতঙ্কে কাঁপছিল, তবুও সে চলেছিল এগিয়ে—আকুল হয়ে পরম বিশ্বাসে সে ডেকেছিল না কি তীর্থদেবতাকে? রাত্রির অন্ধকারে—হঠাৎ কোথা থেকে কে যেন এসে তাকে দেখিয়ে দিল পথ, সে উত্তীর্ণ হল কালরাত্রির বিভীষিকাময় দুর্গম পথের বাধা। সঙ্গীরা অধীর আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিল—সে গিয়ে পৌঁছালো তাদের কাছে। এই সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে সঙ্গী হয়ে পথপ্রদর্শক হয়ে তাকে নিরাপদে পৌঁছে দিল কে? সে কি গ্রাম্য পাহাড়ী, না কি আর কেউ? আধুনিক যুগের ছেলে, এসেছে হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখতে, অলৌকিক অপার্থিব লীলায় তাদের বিশ্বাস হয়তো কম। কিন্তু যিনি সমস্ত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে তিনি ত করুণা বর্ষণ করেই চলেছেন, সে করুণাধারায় অভিষিক্ত হচ্ছেন সবাই, কেউ তা অনুভব করেছেন, কেউ করছেন না।

ঐ ছেলেরাই বলল – আপনারা গাড়ি করে এসেছেন, হিমালয়ের কতটুকু আর কিই বা আপনারা দেখলেন। এই হিমালয়কে জানতে হলে, অনুভব করতে হলে হিমালয়েই থাকতে হয় দীর্ঘদিন চলতে হয় পায়ে হেঁটে, তবেই হয়তো দেখা যায় এর আসল রূপ, আর এর প্রকৃত মহিমার সঙ্গে ঘটে নিবিড় পরিচয়।'

রাস্তা এখন শুধুই চড়াই। কোথাও শ্যামল কোথাও গৈরিক, কোথাও শ্বেতশুভ্র পর্বতের পাশ দিয়ে চলেছে যন্ত্রযান—দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘ মেখলা শৃঙ্গরাজী, দূর দিগন্তে শ্যামবর্ণরেখা। মন্দাকিনী কখনও বাম পাশে কখনও বা ডানপাশে নৃত্যের ছন্দে আনন্দ-কল্লোলে চলেছেন পথের বাধা ডিঙিয়ে, পাষাণের দুর্গ ভেঙে ভেঙে। মাঝে মাঝে উঁচু শৃঙ্গ থেকে দেখতে পাচ্ছি নিচে অনেক নিচে খরস্রোতা নদীর উপরে যেন দুলছে একটি সেতু দুই পাশের পাহাড়ের পীতাভ গৈরিক মাটি ভেঙে ভেঙে পড়ছে তীব্র গর্জনশীলা নদীর মধ্যে, নদী সৃষ্টি করছে ভীষণ আবর্ত কখনও কখনও পাহাড়ের গায়ে নিস্তব্ধ বনানী, জনমানবহীন এক-একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর পাহাড়-পর্বত বনানী

প্রান্তর—সবই পিছনে ফেলে চলেছি। কী ভীষণ, কী মনোহর! আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি--ধীরে ধীরেই পার হয়ে যাচ্ছি সেই সেতু—সেই সঙ্কট। কোথাও পথে প্রায় হাঁটু জল ঝর্ণার প্রবলবেগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে বৃহৎ ক্ষুদ্র শত শত পাথর-এর মধ্য দিয়েই গাড়ি পার হচ্ছে। এদিককার ড্রাইভারবা কি ভীষণ বেপরোয়া, গাড়ির গতি পর্যন্ত কমাতে চায় না--এই বিপদসঙ্কুল পথে জোরে গাড়ি চালাতে তাদের এতটুকুও ভয় নেই। কথা বলে না হর্ণ দেয় না—বিরাট এক একটা বাঁক ঘুরছে – চোখে দেখেই আমরা মূর্ছা যাবার দাখিল, কিন্তু ড্রাইভারের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভীষণ এক একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছি রাস্তাও প্রায় কাঁচা রাস্তাব মত খাবাপ, খাদের সীমা বাম্বের থেকে এক হাতেব মধ্যে—আব পাহাড়ের তো একেবারে গায়ে লাগা। ওগুলি যেন করাল দন্ত বের করে পথের উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ে দেখছে কে যায়। নিষেবের প্রাচার তুলে হরগৌরীর মিলন ক্ষেত্রে অনধিকারীর প্রবেশ প্রতিহত কববার জন্যেই কি দাঁড়িয়ে আছেন শিবের অনুচর ভৈরবগণ। আমবা সভয়ে চোখ বন্ধ করি আব সমস্বরে আতকণ্ঠে ডেকে উঠি রক্ষা কর, উত্তীর্ণ কবে দাও সব বাধা হে ভোলানাথ, হে কেদারনাথ! দয়া কর দয়া কর।

জলি পার্টি'ব মহিলারা ভয়কে জয় করবার জন্যে আরম্ভ করেন প্রার্থনা-সঙ্গীত। নতুন-আসা ছেলেরাও কণ্ঠ মিলিয়েছে তাদের সঙ্গে। আমি গানে যোগ দিতে পারব না। আমার বুক কাঁপে গলা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সুরের এমনি শক্তি ধীরে ধীরে ভয় কেটে যায় — আমিও তখন ছেলেদেব সঙ্গে গাইতে থাকি—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো, দহন দানে।

হে করুণাময়, আমার এই মর্ত্যদেহ তোমার দেবালয়ে প্রদীপশিখার মত জ্বলে উঠে আমাকে যেন ধন্য কবে—

আমাব এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—

তুমি আছ এই বিপদে, এই আঁধারের মধ্যেও আছে তোমার স্পর্শ। আমার নয়নের দৃষ্টি হতে কালো ঘুচিয়ে দিয়ে তোমার আলো আমাকে দেখাও, আমার হৃদয়ের ভয় ঘুচে যাক্।

ধীরে ধীরে ভয় ঘুচল।

গুপ্তকাশী

প্রায় বেলা দুইটায় আমরা গুপ্তকাশীর মন্দিরের নিচে এসে থামলাম। এক উচ্চ শৃঙ্গে মন্দিরটি। স্থানটি অতি মনোরম। লাঠি হাতে নিয়ে চললাম, চড়াইর পথ। তবে পথ বেশি না, তাই উঠতে কষ্ট হল না।

ভিতরে নাতিপ্রশস্ত অঙ্গন। তার একদিকে সুন্দর মন্দির মন্দিরে মহাদেব ও অন্নপূর্ণার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। অঙ্গনে একটি বড় কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে মানুষের তৈরি দুইটি নলের ভিতর দিয়ে দুই দিক থেকে দুইটি প্রাকৃতিক ধারা এসে পড়ছে, আর একদিক দিয়ে আবার জল নিঃসৃত হয়ে গিয়ে 'মন্দাকিনী'তে মিশছে। স্থানীয় পাণ্ডারা বললেন, এই দুইটির একটি যমুনাধারা একটি গঙ্গাধারা। আমরা নেমে এই জল মাথায় স্পর্শ করলাম। মন্দিরটি ও স্থানটি ভারী সুন্দর। এই গুপ্তকাশীর মন্দির বিশাল এক পর্বত শৃঙ্গের উপরে অবস্থিত। মাঝখানে মন্দাকিনী, অপরদিকে আর এক বিশাল পর্বতের উপরে প্রতিষ্ঠিত 'ওখিমঠ', গুপ্তকাশীর শৃঙ্গে উঠলে ছবির মত ওখিমঠ দেখা যায়। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় আমরা সেসব দেখতে পেলাম না।

এর প্রকৃত নাম 'উষামঠ'। ভক্তোত্তম প্রহ্লাদের পৌত্র বলি -সত্যনিষ্ঠ, দাতা ভক্ত-শিরোমণি। কিন্তু তাঁর দোষ তিনি অসুরবংশজাত। বিক্রমে দেবরাজ ইন্দ্র আর অন্যান্য দেবতাদের পরাস্ত করে যখন তিনি স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার করে নিলেন, তখন দেবমাতা অদিতির কাতর প্রার্থনায় নারায়ণ বামনরূপে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনিই যজ্ঞে ব্রতী বলিকে ছলনা করে ত্রিপাদ-ভূমি-স্বরূপ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, সমস্তই অধিকার করে

নিলেন। প্রসন্নচিত্তে সবস্ব দান করে ভগবানের নির্দেশে বলি চলে গেলেন পাতালে।

তারই পুত্র বাণাসুর। তিনিও ছিলেন পরম শিবভক্ত। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। বাণাসুরের কন্যা উষা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উষা এতই অধীর হয়ে উঠলেন যে তাঁর লজ্জা-সম্ভ্রম কিছুই রইল না। সখীর সহায়তায় সুদূর দ্বারকা থেকে মায়াবলে নিজের অন্তঃপুরে অনিরুদ্ধকে নিয়ে এলেন। গোপন মিলনসুধারসে মগ্ন হয়ে রইলেন দুইজনে। কিন্তু সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না। বাণাসুর যখন এ খবর শুনলেন তখন ক্রোধে, অপমানে, ধিক্কারে জর্জরিত হয়ে তাঁর কুমারী কন্যার মর্যাদা লঙ্ঘনকারী অনিরুদ্ধকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন বন্দীশালায়। এই বার্তা পেয়ে যদুবীরদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে বাণাসুরের পুরী আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। বাণাসুর পরাজিত হলেন। পৌত্র অনিরুদ্ধ আর বধূ উষাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন দ্বারকায়। এই উষার নামেই উষামঠ, তথা ওখিমঠ।

আমরা গুপ্তকাশীর মন্দিরে পূজা নিবেদন করে নেমে এলাম নিচে।

অপরাহ্ণ হয়ে এসেছে। কী অপূর্ব ছায়াশীতল পথ দিয়ে চলেছি আমরা! দু'ধারে এবার শুধু গাছ, লতা, ফুল, শ্যামবনরেখা, পাহাড় ও সবুজ শ্যামল। এক একবার মনে হচ্ছে চলেছি গ্রাম-বাংলার স্নিগ্ধ ছায়া-ঘেরা পথে।

বদরিনারায়ণের পথের থেকে এপথ অনেক বেশি দুর্গম, কিন্তু অপরূপ এ পথের সৌন্দর্য আর মহিমা। গৌরী-ক্ষেত্র, শিব-ক্ষেত্র এই তীর্থ। স্বয়ং গৌরীই যেন নিজের হাতে সাজিয়ে নিয়েছেন তাঁর বাসস্থান। পাগল ভোলানাথ রিক্ত সন্ন্যাসীর তপস্যার স্থানটিকে করে রেখেছেন মনোরম। শ্মশানে জেগেছে প্রাণ, মৃত্যুকে জয় করেছে মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা। আমরা চলেছি এই পথ দিয়ে, দুই চোখ ভরে দেখছি তাঁর রূপের প্রকাশ। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। আমরা এসে পৌছালাম রামপুর চটিতে।

রামপুর চটি

আজ এখানে আমাদের যাত্রা শেষ। বাস যাবে শোনপ্রয়াগ পর্যন্ত। ছেলেরা চলে গেল শোনপ্রয়াগে আমাদের আজ রাত্রিবাস রামপুরচটিতে। বাস আমাদের বাজারে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ছোট একটি উপত্যকা, তাতে কয়েকটি দোকান, ছোটখাট একটি বাজার।

একটা উঁচু নিচু পাথরের সঙ্কীর্ণ পথ ধরে আমরা নামলাম। পথে পথে ঝর্ণার জলে পা ডুবে যাচ্ছে, লাঠি ধরে ধরে চলেছি, জলের মধ্যে মধ্যে মাথা তুলে আছে বিছুটিগাছ পায়ে লেগে লেগে পা জ্বলে উঠছে।

চটিতে গেলাম, মাটির দেয়াল, মাটির ঘর কিন্তু দোতলা, কতদিনে ঠিক আগের দিনের একটি চটি দেখতে পেলাম। বিজলীর বালাই নেই, সংলগ্ন স্নানঘর নেই, মোটকথা আধুনিকতার স্পর্শবর্জিত এই চটি। চারদিকে পাহাড়-ঘেরা, ছোট এই উপত্যকায় কিন্তু লোকে লোকারণ্য। শুধু যাত্রী নয়, ঘোড়াওয়ালা কাণ্ডিওয়ালা, ডাণ্ডিওয়ালা আর মালবাহী কুলির ভীড়, এতদিনে যেন মনের মধ্যে অতীতকালের একটি ছবি ফুটে উঠল—চলেছে পদযাত্রীদের এক মিছিল। ক্লান্ত, শীর্ণ জীর্ণ দেহে সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরে ধরে একে একে চলেছেন তীর্থকামী মানুষ দুরারোহ, দুর্গম পথের কি নেই শেষ? কতদূর, আর কতদূর? ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে দুই পদতল, দেহ শক্তিহীন, মন আতঙ্কবিহ্বল। 'কোথায় তীর্থদেবতা প্রসন্ন হও, উদ্ধার কর তোমার চরণপ্রান্তে।

দিনান্তে ক্লান্ত যাত্রা সমাপ্ত হত এসে এক একটি দীনহীন আশ্রয়ে। ক্লান্তি দূর হতে না হতেই নিজের হাতে করতে হত আহারের আয়োজন, আহার শেষে বিশ্রামের ব্যবস্থা।

চটির ক্ষীণ আলোকে ক্লান্ত চোখগুলি ক্ষণিক উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তারপরেই ঢলে পড়ত ঘুমে। তখন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রির শান্তি নেমে আসত, ছুঁয়ে যেত নিদ্রিত যাত্রীদের ললাট। ভোরেই আবার যাত্রা, পায়ে চলার যাত্রাই বেশি, অসমর্থ বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের কেউ কেউ শেষপর্যন্ত নিতেন কাণ্ডি, কেউ ডাণ্ডি, কেউ বা ঘোড়া।

আমাদের আশেপাশেও দেখতে পাচ্ছি, ঘোড়া ডাণ্ডি আর কাণ্ডির ভীড়।

আমাদের যে ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে সে ঘরাট মাটির, কিন্তু দোতলা। আমরা উপরে উঠে গেলাম, ঘরে পাতা রয়েছে বড় বড় হোগলার মাদুর, তার পাশে একধারে মাটির তৈরি কয়েকটি উনান। যারা নিজেরা রেঁধে খান তাঁদের জন্যেই এই ব্যবস্থা। ঘরে কোনও আলো নেই, এমন কি হ্যারিকেনও ধারেপাশে কোথাও দেখলাম না, মোমবাতি কিনে এনে জ্বালান হল। আধো আলো, আধো ছায়া ঘেরা পার্বত্য সন্ধ্যাটিকে ভারী ভাল লাগল —যেন অতীতের একটুকু স্পর্শ পেলাম। বাইরে গম্‌গম করছে মানুষ। দোকান হোটেলগুলি কেরোসিনের 'ডিবিয়া' জেলে তাদের সামান্য আয়োজন মেলে ধরেছে যাত্রীদের সামনে। দোকানে বসে চা খাচ্ছেন যাত্রী, ঘোড়াওয়ালা, ডাণ্ডি ও কাণ্ডির বাহকেরা। ঘোড়াগুলি একধারে ঘুরছে ; উঠানের মাঝখানে এক বিশাল জলাধার তার কাছে বিরাট ভীড়। কেউ জল নিচ্ছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ করছে স্নানের আয়োজন। সমস্ত কলকোলাহল ভেদ করে কানে আসছে ঝর্ণার শব্দ। ঘরের খুব কাছেই সে ঝর্ণা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। পাহাড়ী কন্যা আর বধূরা সেখান থেকে কলসি ভরে জল নিয়ে যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াই, ওদের সঙ্গে কথা বলি। এদেশের মেয়েরা যে যাত্রীদের কাছে সুঁচ-সুতা চায় সে কথা আমি জানতাম, কিন্তু আসার আগে সে কথাটা একবারও মনে পড়ে নি, তাই সুঁচ-সুতাও আমি আনি নি। আমাদের সঙ্গিনীরা অনেকেই প্রচুর সুঁচ-সুতা নিয়ে এসেছেন, পথে-পথেই বিলিয়ে যাচ্ছেন। আমার কাছেও এখানকার মেয়েরা চাইল, আমি দিতে পারলাম না। ভারী খারাপ লাগল।

হরিদ্বার আসার পথে ট্রেন থেকেই আমি অমরবাবুকে বলে আসছি, আমি কাণ্ডিতে করে যাবো, ঘোড়ায় চড়ার সাহস নেই আমার, আর ডাণ্ডি করবার নেই পয়সা, ডাণ্ডিভাড়া দুইশ' টাকা, কাণ্ডি একশ', ঘোড়াও একশ'—কাজেই আমার কাণ্ডিই ভালো।

আজও তাই বললাম, কিন্তু ম্যানেজার কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, 'কাণ্ডিতে ভীষণ কষ্ট হবে আপনার, রাস্তা খাড়া চড়াই, কাণ্ডিওয়ালা বারে

বারেই আপনাকে নামিয়ে দেবে, সেও তো একটা মানুষ, আর একটা মানুষকে সারাক্ষণ কাঁধে নিয়ে কেমন করে এই দুস্তর চড়াই পার হবে? অনেকেই তো ঘোড়া নিচ্ছেন; আমি বলি আপনিও ঘোড়া নিন, না হয় হেঁটে যান, কাণ্ডিতে আমি আপনাকে যেতে দেবো না।'

হায় রে ভাগ্যলিখন, এত পথ অতিক্রম করে এসে শেষে অশ্বারোহণ? আরোহণ তো নয়, অবধারিত অবরোহণ, এক কথায় পতন ও মরণ! কি করি? না কি হেঁটেই যাব; কিন্তু যা শুনছি পথের কথা, সেও তো অসম্ভব। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলাম। অগত্যা, আর যা থাকে কপালে, কাল সকালে যা হবার হবে। এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

খাওয়া সারা হল, শুয়ে পড়লাম। আমাদের ঘরের সঙ্গেই একটি পাহাড়ের চুড়া, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়, নিচে ঘন জঙ্গল। রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে এল, ঝিম ঝিম করছে চারিদিক, নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢাকা স্তব্ধ আকাশ, কালো কালো পাহাড়ের ছায়া ঘেরা ছোট্ট উপত্যকা। কি অদ্ভুত অনুভূতি যে মনে জেগে উঠে কেমন করে তা বোঝাব?

মোমবাতির আলোয় স্বল্পালোকিত মাটির ঘরে শুয়ে আছি, ধীরে ধীরে কখন চোখের পাতায় ঘুম নেমে এল, রাত্রি কেটে গেল গভীর ঘুমে।

১৬ সেপ্টেম্বর '৭৩

ভোর না হতেই সবাই উঠে পড়লেন। প্রস্তুত হতে বেশি সময় লাগল না। ঘোড়া, কাণ্ডি, ডাণ্ডি হাজির। একে একে রওনা হল কাফেলা।

সারি সারি চলেছে চার চার জন বাহকের কাঁধে কাঁধে এক একটি ডাণ্ডি (অনেকটাই খোলা পাল্কির মত, এতে আরাম আছে) তারপর কাণ্ডি-একজন কুলির পিঠে বাঁধা একটি ঝুড়ি—সামনে এক চিলতা কাঠ, ঝুড়িতে বসে ঐ কাঠে পা রাখার ব্যবস্থা।

আমি একটি যুবক কাণ্ডিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে তুমি?'

আতঙ্ক-মিশ্রিত চোখে আমার দেড়মণি 'তনু'টির দিকে তাকিয়ে যেন একটু করুণ সুরেই সে বললো, পারব মাঈজী।'

ইত্যবসরে এক ছোকরা ঘোড়াওয়ালা এগিয়ে এসেছে, আমাকে ডাকছে— 'তুমি এদিকে এস মাঈ, তোমার জন্যে এ ঘোড়া ঠিক করা হয়েছে, এস।'

এক পা এগিয়েছি এর মধ্যে ছুটে এল আর একজন, ছোকরাকে ঠেলে দিয়ে সামনে নিয়ে এল আর এক ঘোড়া। এ ঘোড়াই আমার জন্যে ঠিক করেছেন ম্যানেজার।

আর উপায় নেই উঠতেই হবে ঘোড়ার পিঠে। সাতজন্মে ঘোড়ায় চড়া দূরে থাক্ স্বপ্নেও কোনও দিন আমাকে ঘোড়ারোগে ধরে নি। এখন কি করি?

আমাকে একটি উঁচু পাথরে দাঁড় করিয়ে ঘোড়া আনা হল সামনে। ঘোড়াওয়ালা যতই তাগাদা দিচ্ছে ততই আমার 'তাকদ' কমে আসছে। আমার ঘোড়াওয়ালার নাম বচনলাল। তার বচনের চোটে শেষপর্যন্ত চোখমুখ বন্ধ করে 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়লাম, আঁকড়ে ধরলাম বচনলালের কণ্ঠ।

কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিল পাকড়ি
দুই জনা দুই জনে

আমি বচনলালকে ধরলাম, বচনলালও আমাকে ধরল। তারপরে উঠে বসলাম কোনও মতে। দুইদিকে দুই রেকাবে পা 'ফিট' করে দিল, তাও কি জায়গা মত থাকতে চায়, বারে বারেই সরে যাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে আটকান লোহার আংটাটাকে আমি দুই হাতে সজোরে চেপে ধরেছি, ঘোড়া চলল টগবগিয়ে নয় 'কদম কদম বাঢ়ায়ে', লাগাম ধরে বচনলাল চলল সঙ্গে সঙ্গে। আমার আগে আগে বুলুদি, নীলুদি, মাসীদিরা ঘোড়ায় চড়ে বেশ মিলিটারি ভঙ্গীতেই চলে গেলেন, আমি পড়লাম সবার পেছনে। চলছি আর ছোটবেলার শেখা কবিতাটা সভয়ে মনে পড়ছে—

ঘোড়ায় চড়িল, চড়িয়া পড়িল,
পড়িয়া উঠিল, আবার পড়িল—

হায়, দ্বিতীয়বার পড়ার পরে আর যদি উঠতে না পারি, একেবারে হাড়গোড় ভেঙে মরি, তবে কি হবে?

চলেছি আজ গৌরীকুণ্ডের পথে। দুর্গম হিমালয়ের বহু পথ অতিক্রম করে এসেছি এই ক'দিনে, কিন্তু এমন নয়ন-ভুলান পথ-শোভা এতদিন দেখতে পাই নি। কত ফুল ফুটে আছে খাদের ধারে, পর্বতশীর্ষে পথে পথে। ডালিম গাছে লাল ডালিমগুলি পাতার আড়াল থেকে যেন নবোঢ়া বধূর মত সলজ্জ দৃষ্টিপাতে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে গোলাপ গাছ থেকে উঁকি দিচ্ছে দুই একটি রক্তাভ কিশোরী কুঁড়ি। ছায়াঘেরা সবুজ বনের মধ্য দিয়ে চলেছে সঙ্কীর্ণ পথরেখা, কোথাও নির্ঝরিণী-ধারার স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শে সঞ্জীবিত শ্যাম ধরণী, কোথাও দিগন্তবিস্তৃত শ্বেতশুভ্র গিরিশৃঙ্গ দীপ্ত সূর্যালোকে ঝলসিত সুনীল আকাশ! পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাদা মেঘের সমারোহ। আমরা এগিয়ে চলেছি—উপরে উঠে চলেছি—মেঘলোকে? এ কী বিস্ময়, এ কী অপরূপ! আবার মাঝে মাঝেই পথের উপরে বেঁকে ঝুঁকে আছে বিরাট বিরাট পাথরের শৃঙ্গ, আমাদের ঘোড়ায় চড়ার ঔদ্ধত্য আর সীমাহীন স্পর্ধাকে যেন বাধা দিতে চায় তারা। মাথা নিচু করে চলেছি, নয়তো আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো মুহূর্তে। আগে থাকতেই বচনলালও সাবধান করতে থাকে, ঝুঁকো মাঈজী ঝুঁকো।

একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষেই চলেছে ঘোড়া। খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে নিশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। তার পিঠে চেপে বসে আছি, তার বুক ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে টের পাচ্ছি সেই কম্পন। পশুর কথা বলবার শক্তি নেই, ওরা মূক না হলে নিশ্চয়ই তার পিঠে চেপে বসা সৌখীন আরোহীকে জিজ্ঞাসা করত, 'পশু কে, তুমি না আমি?' কি এক একটা খাড়া চড়াই, একপাশে কঠোর রুক্ষ বিরাট বিরাট পাথরের পাহাড়; সঙ্কীর্ণ পথরেখার আর একপাশেই গভীর খাদ, এর মধ্যে দিয়ে অতি সাবধানে চলেছে ঘোড়া, চালক চলেছে সঙ্গে সঙ্গে অতিকষ্টে, অতি সন্তর্পণে। পথে জলধারা দেখে ঘোড়াটা ছুটে গিয়ে মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছে, যেন শুষে নিতে চাইছে সমস্তটা জল।

ঘোড়ার পিঠে শক্ত করে লোহার কড়াটা ধরে বসে আছি, কোমরে ভীষণ লাগছে, জিনের শক্ত চামড়া আর লোহার কড়ায় কেবল খোঁচা লাগছে, সোজা হয়ে বসতে গেলে মাথায় পাহাড়ের ধাক্কা লাগবে। প্রথমে ভীষণ কষ্ট

হচ্ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে একটু যখন রপ্ত হয়ে এল, তখন চারিদিক দেখতে দেখতে চললাম। আমার একটা ছোট ব্যাগ আর জলের বোতল বচনলালের কাঁধে। বচনলালের কাঁধের ব্যাগে রয়েছে পান; কিন্তু হায়, আমি খেতে পারছি না। আমার তো দুই হাতই বন্ধ। এদিকে আজ দু'দিন ধরে পান আর কিনতেও পাওয়া যাচ্ছে না। শুনলাম কেদারনাথ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যাবে না। সর্বনাশ, আমার পান তো ফুরিয়ে এসেছে, আরও চারদিন কাটবে কি করে। ডানকুনির দিদি তাঁর হাজারের ভাণ্ডার' থেকে কয়েকটা দিয়েছিলেন বলে এখনও চলছে—তারপর কি হবে? ভালই হল বচনলালের কাঁধেই থাকুক এই দুর্লভ ধন, খেতে যে পারছি না সেটাই লাভ সঙ্গে আছে আপাততঃ এই সান্ত্বনা।

রাস্তা মাঝে মাঝে ভাঙা, খুবই সঙ্কীর্ণ, অতিকষ্টে ঘোড়া সেই সঙ্কট পার হচ্ছে। বেলা প্রায় এগারোটায় আমরা এসে পৌঁছালাম ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির-প্রান্তে। এখানে কালীকমলিওয়ালার সুন্দর দোতলা ধর্মশালা আমাদের তাতেই ওঠানো হল। ধর্মশালার পাশেই নারায়ণের মন্দির। মন্দিরের কাছে দুইটি কুণ্ড—একটি ব্রহ্মকুণ্ড, অপরটি শিবকুণ্ড। এই দুই কুণ্ডেই স্নানান্তে তর্পণ করা বিধি। মন্দিরের ভিতরে সুন্দর নারায়ণমূর্তি, তাঁর দুই পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পশ্চাতে কুবের। নারায়ণ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী আর ধনদায়িনী লক্ষ্মী তাঁর শক্তি, কুবের ভাণ্ডারী।

নারায়ণের সামনে অনতিদূরে জ্বলছে এক অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড। দীর্ঘ কঠোর তপস্যার অন্তে যে দিন উমা পার্বতী আর তাঁর চিরপতি দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহ হয়েছিল, সেদিন সাক্ষীরূপে সমুখে ছিলেন নারায়ণ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগের সাক্ষী তিনি—তাই ত্রিযুগীনারায়ণ। সেদিন স্নানাবসানে শুদ্ধগাত্রী উমা যখন কুমারী হৃদয়ের সকল সুধা অঞ্জলি ভরে নিয়ে নিবেদন করেছিলেন শঙ্করের পায়ে, সেদিন কি তাঁর প্রেমের রক্তরাগে মহাযোগী রজতশুভ্র শিবের ললাট রঞ্জিত হয়ে ওঠে নি? তিনি কি শান্ত প্রসন্ন হাস্যে গৌরীর নম্রনত আননকে উদ্ভাসিত করে তোলেন নি?

অনাদি জনক-জননীর বিবাহে যে পবিত্র হোমানল প্রজ্বলিত হয়েছিল, আজও তার শিখা রয়েছে অম্লান।

'যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব,' 'আমার হৃদয় তোমার হোক্, তোমার হৃদয় আমার হোক,' এই মন্ত্রে হোমানলে আহুতি দিয়েছিলেন উমা আর শঙ্কর। তুষারাবৃত নিভৃত এই গিরিশৃঙ্গে, চিরদম্পতির বিবাহ বাসরের সাক্ষী নারায়ণের সামনে আজও রয়েছে সেই হোমকুণ্ড আর হোমানলের শিখা জ্বলছে অনির্বাণ।

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারম্বার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূরতি।
ওই হের ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি—
দুর্গম দুঃসহ মৌন, জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে, উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান দরিদ্র রিক্ত আভরণহীন দিগম্বর,
হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কী লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা, নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশিরে রয়েছেন ঘিরি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

—রবীন্দ্রনাথ

যাত্রীরা এই কুণ্ডে কাঠ কিনে নিক্ষেপ করেন, আমরাও করলাম। নারায়ণের কাছে সামান্য পূজা দেওয়া হল, প্রসাদ পেলাম, হোমকুণ্ডের ভস্মও নিলাম খানিকটা। দীর্ঘদিন ধরে বহুশ্রুত এই অনির্বাণ কুণ্ডটি দেখবার যে সুতীব্র কামনা ছিল, আজ তা পূর্ণ হল।

সকালবেলায় রোদ ছিল, এখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আর কিছুদিন পরেই এখানে বরফ পড়া শুরু হবে, তখন পূজারী, সেবক সবাই চলে যাবেন নিচে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তখন আগুন জ্বলবে কি করে?' তাঁরা বললেন, বিরাট বিরাট গাছের গুড়ি কুণ্ডে রেখে তাঁরা চলে যান, ছয় মাস পরে এসেও ছাই-এর নিচে আগুন দেখতে পান। পাশে বরফাবৃত ঘরের মধ্যে দুই এক জন সেবকও না কি থাকেন বলে শুনলাম।

মন্দির আর কুণ্ড নিচে, উপরে দুই চারটি দোকান। এখান থেকে নারায়ণের ছবি কিনে নিলাম। এখানে সামান্য কিছু খাবার ব্যবস্থা হল, আমরা খেয়ে নিলাম। এখন রওনা হতে হবে গৌরীকুণ্ডের পথে। সুধীর ওরা সবাই আসছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, কারও হাতে হাতা খুন্তি, কারও হাতে রান্নার অন্যান্য সরঞ্জাম। তারা এই দুর্গম, দুস্তর চড়াই পার হচ্ছে পায়ে হেঁটে, হাঁপাতে হাঁপাতে। আমাদের মাল খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে কুলিরা চলেছে আগে আগে। আত্মীজনের বাক্স-বিছানা, কাপড় চোপড় সমস্তই ওদের কাছে ওরা পৌছে দেবে গৌরীকুণ্ডে, তারপর কেদারনাথে। একটি জিনিসও চুরি করবে না, এমনি বিশ্বাসী ওরা।

বচনলাল এল, ঘোড়াও হাজির। আবার কসরৎ, আবার পতনোন্মুখ দেহটাকে কোনও মতে ঘোড়ার পিঠে স্থাপন করা গেল। কিন্তু ভাল লাগল না। বললাম, 'বচনলাল, আমাকে নামিয়ে দাও, আমি একটু হেঁটে যাই। বচন রাজি হল, খাড়া চড়াই-এর পথে সে আমাকে নামতে দেয় না। এখন অনেকটা উৎরাই, তাই সে আর আপত্তি না করে বলল, সামনে নদীর পুল পর্যন্ত গিয়েই আমি যেন বিশ্রাম করি। প্রায় দুই মাইল হাঁটতে আমার কিছু কষ্ট তো হলই না, বরং আনন্দই পেলাম। আস্তে আস্তে এসে পৌছলাম সম্ভবতঃ শোন নদী আর মন্দাকিনীর সঙ্গমে। পুলের কাছে এসে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে বচনলাল এল তার ঘোড়া নিয়ে, এবার থেকে আবার চড়াই। অতি সংকীর্ণ এক ভাঙা পথরেখার উপর দিয়ে পাহাড়ী মেয়ে পুরুষেরা চলেছে সঙ্গে ছাগল, ভেড়া দুই-চারটা মহিষ। ছাগলের পিঠে বোঝা।

ঐ পথ দিয়েই যেতে হবে। সঙ্গীরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছেন, হেঁটে আসতে আমার দেরি হয়ে গেছে, সময় সঙ্কীর্ণ, রাস্তা সঙ্কীর্ণ, চলেছি এক অজানা দুর্গম পথে। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার', পারাবার না হোক দুস্তর ঝর্ণাধারা পার হতে হবে, হচ্ছেও। রাত্রি নিশীথে এই গিরি লঙ্ঘনের চেষ্টা অসম্ভব, সন্ধ্যার আগেই পৌছাতে হবে গৌরীকুণ্ডে। একে তো পাহাড়ের রাজ্যে সূর্য বেশিক্ষণ থাকেন না, তার উপরে আবার মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ, মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও হচ্ছে। বর্ষাতি আছে ঘোড়ার পিঠে, আমার কম্বলাসনের তলায়, আমি যে সেটা টেনে এনে গায়ে জড়াবো সে সম্ভাবনা একেবারেই কম, এই পথে আমি নামব কোথায়, আবার ঘোড়ায় উঠবোই বা কেমন করে? বৃষ্টিতে ভিজছি, কাপড় বেসামাল, ঘোড়ায় চড়ার অভিজ্ঞতা তো সাতজন্মেও ছিল না, তাই কাপড় পরার কায়দাটাও শিখি নি। জনহীন পার্বত্য পথে, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বিরাট বিরাট শৃঙ্গের নিচে দিয়ে অরণ্য সমাচ্ছাদিত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছি একা এক একবার ভয়ে বুক কেঁপে উঠছে। অসহনীয় নীরবতা যেন চেপে ধরেছে। ক্লান্ত ভীত স্বরে ডেকে উঠি, 'এ বাবা বচনলাল, আউর কেত্‌না দূর? বৃষ্টি কি আউর জোরসে আতা হ্যায়? রেন কোট ক্যায়সে গায় দেগা?'

বেচারা আমাকে আশ্বাস দেয় পায়ের কাপড় টেনে টুনে ঠিক করে, রেন কোটটার একটা প্রান্ত কোনও রকমে বের করে আনে। কিন্তু তাতে আর কতটুকু বৃষ্টি আটকায়।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে মাথার উপরে, পথের ধারে ঝুঁকে আছে—যেন করাল দন্ত বের করে, ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে চেয়ে আছে কালো কালো পাহাড়, আমি চলেছি, চলেছি অজানা এক দুর্গম পথরেখা ধরে।

বৃষ্টি জোরে নামল। দ্রুত চলতে চাইছে ঘোড়া, ঘোড়ার পা হড়্‌কে যাচ্ছে, ঝুঁকে থাকা পাহাড়ের কর্কশ পাথরের ঘায়ে মাথাটা এই বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়! চিৎকার করে উঠি, 'এ বচনলাল। তোমারা ঘোড়া তো লাফাতা হ্যায়, ধরো ধরো, হামারা মাথা চূর্ণ হো যায়ে গা।'

আমার হিন্দী শুনে বচনলালের বচন থেমে যায়। আমার কথার জবাব দেওয়া নিরর্থক মনে করে সে নির্বিকার মুখে তার ঘোড়ার সঙ্গেই কথা বলতে থাকে—'আরে বেটা সামহালকে চল, চল ইধার-উধার', নানা ধারায় নির্দেশ দিতে দিতে চলল এগিয়ে।

বৃষ্টিতে কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে, শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি ; জানি না কতক্ষণে পৌছাব কুমারী গৌরীর তপস্যাক্ষেত্রে। সন্ধ্যা হয় হয়, দিগন্ত অন্ধকারে ঢেকে গেছে, চারদিকে দাড়িয়ে আছে গৌরীক্ষেত্রের পাষাণবক্ষ প্রহরী। ভীত আতঙ্কিত এক অনধিকারী চলেছে তাদের পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, তারা কি ছেড়ে দেবে পথ, খুলে দেবে দরজা ?

বচনলাল বলল, যেন ঈশ্বরের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল অভয়বাণী, 'এই যে এসে গেছি মাঈ, আর দেরি নেই।'

গৌরীকুণ্ড

ছয় মাইল পথ চড়াই অতিক্রম করে এবার সত্যই এলাম। পথ ছেড়ে দিল অতন্দ্র প্রহরীরা. সঙ্কীর্ণ এক কর্কশ পিচ্ছিল পথরেখা ধরে ধরে এগিয়ে চলল ঘোড়া। দূরে দেখতে পাচ্ছি ঘর. দোকান, মন্দির। জয় মা জগজ্জননী, জয় বাবা কেদারনাথ, সকল বাধা অতিক্রম করে আমি এসেছি, তোমার দ্বারপ্রান্তে।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। ম্যানেজার দাঁড়িয়ে আছেন চটির সামনে। ঘোড়া থেকে বেপথুমতী (লজ্জায় নয়, শীতে) আমাকে তিনিই ধরে নামিয়ে নিলেন। বাসস্থান নির্দিষ্টই ছিল। দোতলা কাঠের ঘর। গিয়ে দেখি, কম্বল-শয্যায় বসে শুয়ে আরাম করছেন আমার সহযাত্রিণীরা। 'জলিপার্টি' আর আমার স্থান সব সময়ে এক ঘরেই করা হয়েছে।

মাল এসে নিচে জমা হয়ে আছে, মালের পাহাড়। সেখান থেকে বাক্স বের করে আনা সহজ নয়, অথচ শাড়ি, জামা, সব রয়েছে তাতে, বদলাতে না পারলে জ্বর উঠবে নির্ঘাৎ, তাছাড়া শীতে তো কাঁপছিই। বহু কষ্টে বাক্স উদ্ধার করে আরও নিচে গিয়ে দেখি কাছাকাছি দুইটি কুণ্ড। একটির জল

হলুদ রং-এর, ঠাণ্ডা, দ্বিতীয়টিই গৌরীকুণ্ড, উষ্ণ জলে পূর্ণ। বদরিনাথ ধামের উষ্ণ কুণ্ডের মতই এই কুণ্ড। তাড়াতাড়ি এই সন্ধ্যাবেলাতেই চলে গেলাম কুণ্ডের ধারে, নামলাম আস্তে আস্তে। বরফের রাজ্যে এ কী বিস্ময়, এ কী করুণার প্রকাশ! পাশে প্রায় সমতলেই বয়ে চলেছেন মন্দাকিনী, কী ভীষণ তাঁর প্রবাহ, কী ভীষণ তাঁর গর্জন। মনে হচ্ছে, সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়িয়েছি, শুনছি সমুদ্র-গর্জন।

স্নান করে শরীর সুস্থ হয়ে উঠল।

রাত্রি হয়ে গেছে মহান এই তীর্থে আজ আমাদের রাত্রিবাস। নিচে চলেছে অবিরাম যাত্রীর আনাগোনা, শত শত কণ্ঠের কোলাহলে মুখরিত ছোট প্রাঙ্গণ। গৌরীর মন্দিরে বেজে উঠল শঙ্খরব। রুদ্র ছন্দে বিরামহীন নৃত্য করে চলেছেন মন্দাকিনী, সুগম্ভীর ভৈরব রাগে কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে দেবাদিদেবের স্তুতিগান।

এই তো গৌরীর তপস্যার স্থান। কেদারশৃঙ্গের নিচেই এই গৌরীকুণ্ড। কেউ কেউ বলেন এঁরই নাম গৌরীশৃঙ্গ। শিবধাম কৈলাস শিখর এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

কৈলাস পর্বতে ধ্যানাসনে বসেছেন রজতগিরিনিভ শশাঙ্কমৌলি শিবশঙ্কর। কেউ যেন সে ধ্যান না ভাঙে—তাই প্রহরা দিচ্ছিলেন শিবের ভৈরব অনুচরগণ। নিষেধের তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন নন্দী—মহাসমাধিমগ্ন যোগীর এই নিভৃত সমাধিক্ষেত্রে দেব দানব, কিন্নর, মানব কেউ এস না, কেউ করো না অনধিকার-প্রবেশ।

তবু একদিন বসন্ত এল—অকালবসন্ত। নিস্তব্ধ কৈলাস শিখর যেন জেগে উঠল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—শুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত করল হিমগিরি। দক্ষিণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল বিকশিত কুসুম গন্ধ, নন্দিত হতে থাকল শিবধাম। এমন মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এলেন দেবগণ—হিমাদ্রির কাছ থেকে চেয়ে আনলেন শুচিস্মিতা কুমারী গৌরীকে—তাঁর পেছনে রয়েছেন পুষ্পধন্বা মদন। মহাযোগী শিবের ধ্যান ভাঙতে হবে, তাঁকে করতে হবে ক্রিয়াশীল—শিব-পুত্র না হলে ধ্বংস হবে স্বর্গ—ধ্বংস হবে এই সৃষ্টি।

অপরূপ আভরণে—রত্নে, অলঙ্কারে সজ্জিতা উমা এসেছেন শিথিল কম্পিত চরণে। লজ্জা-নম্র আঁখি দু'টি আনন্দের অশ্রুভারে উচ্ছ্বসিত হতে চায়, মনে জাগে শঙ্কা, পাব কি তাঁকে ? আমার এ বরমাল্য গ্রহণ করবেন কি তিনি ? আমার প্রভু, আমার পরম দেবতার প্রসাদ কি আমি পাব ?

বেপথুমতী কুমারী দাঁড়ালেন তাঁর চিরবাঞ্ছিতের সামনে রূপের জ্যোতিতে, আভরণের দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠল চারিদিক। তখন পঞ্চশরের আঘাত হানলেন মদন পঞ্চাননের অঙ্গে। ঈষৎ উদ্বেজিত, ঈষৎ বিরক্তিতে উদ্বোধিত হলেন ধ্যানমগ্ন মহাদেব, ধ্যান ভঙ্গ হল তাঁর।

পঞ্চশরের কি এতখানি তীক্ষ্নতা ছিল, আত্মারাম মহাযোগীর ধ্যান-ভঙ্গ করার শক্তি আর স্পর্ধাও কি ছিল মদনের ? তবু কামজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী শঙ্করের ধ্যানভঙ্গ হল।

সম্মুখবর্তিনী কুমারী উমার সলজ্জ নম্র নেত্রপাতে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যে প্রেমের আলো, সেই আলো কি শঙ্করের ললাট ছুঁয়ে যায় নি ? কুমারী হৃদয়ের সবটুকু সুধা মন্থন করে যে অর্ঘ্যখানি সাজিয়ে ছিলেন উমা, তার সুরভি কি ভোলা মহেশ্বরের অন্তরে দোলা দিয়ে যায় নি ?

শঙ্কর চোখ মেলে তাকালেন। অদূরে দাঁড়িয়ে মদন, হাতে ফলশর। ধ্যান ভঙ্গের অশান্তিতে বিচলিত মহাদেবের ত্রিনয়ন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। হর-ক্রোধানলে মুহূর্তে মদন ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। ব্যর্থতার লজ্জায় ফিরে গেলেন প্রত্যাখ্যাতা উমা। হিমালয়ের নিভৃত অন্তঃপুরের পাষাণতলে লুটিয়ে পড়লেন অসীম বেদনায়, দুঃসহ দুঃখের রাত্রি কাটল চোখের জলে।

হে ভোলানাথ, রূপে তোমায় ভোলাতে গিয়েছিলাম আমি। আর নয়—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলা'ব।

— রবীন্দ্রনাথ

আমি তোমাকে লাভ করব তপস্যায়, তোমাকে পাব প্রেমে'

উমা একে একে খুলে ফেললেন সব সজ্জা, ত্যাগ করলেন সকল রত্ন-অলঙ্কার। জননীর আর্তক্রন্দন, পিতার বুকভরা স্নেহ কিছুই তাঁকে বেঁধে রাখতে পারল না।

যোগিনীর বেশে তিনি চলে এলেন এই গৌরীশৃঙ্গে, বসলেন কৃচ্ছ্র-কঠোর ধ্যানাসনে মহাযোগীর চরণ পাবার আশায়। কেটে গেল কত দিন, কত কাল অপর্ণা বসে রইলেন ধ্যানাসনে, স্থির অচঞ্চল। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে দেহ শীর্ণ, জীর্ণ, কিন্তু হৃদয় ভরে উঠেছে সুধারসে। 'কামে যাঁকে পাই নি, তাঁকে পেয়েছি প্রেমে, দেহ যাঁর চরণ স্পর্শ করতে পারে নি তিনিই তো জুড়ে আছেন অন্তরে। আর তো আমার চাওয়ার কিছুই নেই।

আবারও মহাদেবের ধ্যান ভাঙল, পঞ্চশরে নয়, গৌরীর প্রেমের আলোর ছোঁওয়ায়, তার তপস্যাপূত অন্তরের ভক্তি-অঞ্জলি শিবের চরণ স্পর্শ করল।

ব্রহ্মচারীর বেশে এসে দাঁড়ালেন দেবাদিদেব শিব তপস্বিনী উমার সামনে, বললেন, 'রাজনন্দিনী, সুখলালিত, সুকোমল তোমার তনু, কেন তুমি বৃদ্ধ, রিক্ত শ্মশানচারী শিবের জন্য এই কৃচ্ছ্র সাধন করছ? তুমি মনোহারিণী কেন দুঃখের আগুনে নিজেকে দগ্ধ করবে? ফিরে যাও গৃহে। অন্য কোনও দেবতাকে পতিত্বে বরণ কর।'

তপোকৃশা উমার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল বললেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ, প্রণাম জানাই আপনাকে। কিন্তু আপনি এখনই চলে যান এখান থেকে, শিবনিন্দা সহ্য করব না আমি।'

হেসে উঠলেন ব্রহ্মচারী, আর সেই হাসির আলোয় উমা দেখলেন তাঁর দয়িত, তাঁর পরম দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। উমা লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চরণে, চোখের জলে সিক্ত হল শঙ্করের দুই পদতল।

একই অখণ্ড অদ্বয় সত্তার দুইটি রূপ, দুইটি প্রকাশ। একটি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষ, আর একটি সগুণ, ক্রিয়াশীলা মহাশক্তি। অবিচ্ছিন্ন শিবশক্তি, অভেদ পুরুষ-প্রকৃতি। শুধু লীলাভেদে প্রকাশভেদ, বিচ্ছেদ-মিলন শুধুই খেলা। এই সেই লীলাক্ষেত্র, এই সেই গৌরীশৃঙ্গ।

১৭ সেপ্টেম্বর,

ভোরে উঠলাম, কুণ্ডে স্নানও সারা হল। কাল বৃষ্টিতে ভিজে এসে শরীরটা খারাপ হয়েছে, জ্বরও হচ্ছে প্রায় রোজই। কিন্তু অদ্ভুত, রাত্রের সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণা ভোরবেলায় তপ্তকুণ্ডে স্নান করার পরেই যেন কমতে থাকে। এক একবার মনে হয় এই অসমর্থ দেহ নিয়ে আর এক পা অগ্রসর হতে আমি পারব না; মাথায় ও বুকে অত্যন্ত কষ্ট; ভয় হয় কখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কিন্তু আজ পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ পথ নিরাপদে অতিক্রম করে এলাম, সে কি আমার ক্ষমতায় না তাঁর করুণায়?

কাল যখন গৌরীকুণ্ডে এলাম, তখন ঘন অন্ধকারে আকাশ ঢাকা ছিল, বৃষ্টিও পড়ছিল মাঝে মাঝে, নিকষ কালো রাত্রির কালীমূর্তিই দেখেছিলাম তখন, 'পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা' স্বর্ণলতিকা উমাকে দেখতে পাই নি। আজ যেন তাঁকে দেখলাম। পত্রে পুষ্পে, শ্যাম অরণ্যরেখায় শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিকীর্ণ হচ্ছে তাঁর তপ্তকাঞ্চনবর্ণের দ্যুতি।

আজ আমাদের তীর্থযাত্রা সমাপ্তির পথে। আজ আমরা কেদারনাথের দর্শনাভিলাষী।

পুণ্য সমুজ্জ্বল প্রভাতের আকাশে দেখা দিল অরুণ রাগ, আমাদের যাত্রাপথ রঞ্জিত হল সেই প্রসন্ন আশীর্বাদে। 'জয় কেদারনাথজীকি জয়' বলে আমরা যাত্রা করলাম কেদারের পথে।

আগে আগে চলেছে ডাণ্ডি, চারজন করে কুলি, তবু অতিকষ্টে চড়াই ভাঙছে তারা তারপর কাণ্ডি, একজন মাত্র কুলি বয়ে নিয়ে চলেছে আর একজনকে, কি অপরিসীম কষ্টে পথ পার হচ্ছে। ভাগ্যে আমাকে কাণ্ডি করতে দেন নি ম্যানেজার। কাণ্ডিতে উল্টাদিকে মুখ করে বসে আছেন এক একজন বৃদ্ধা, মুখে চাদর ঢাকা দিয়ে, সমস্ত রোদের তাপটা এসে পড়ছে মুখে, চোখ বন্ধ, হিমালয়ের পথে চলেছেন হিমালয়ের নয়নাভিরাম রূপে না দেখে। ভাগ্যে ঘোড়া করেছিলাম, তাই তো দেখতে পাচ্ছি এই মহামহিমা, দেখতে পাচ্ছি হিমালয়ের অফুরান রূপ। আমরা চলেছি কেদারনাথের ধামে, ক্রমে উঁচু থেকে উঁচু হয়ে চলেছে আমাদের

বন্ধুর পথ, আর দর্শন শেষে পরিপূর্ণ মন নিয়ে নিচে নেমে আসছেন যারা, তাঁদের মুখে সার্থকতার দীপ্তি, দর্শনের আনন্দে চোখ উজ্জ্বল। যুক্ত করে নমস্কার করে তাঁরা আমাদের অভয় দিয়ে যাচ্ছেন—'জয় কেদারনাথ, এগিয়ে চলুন, আর বেশি কষ্ট নেই।' এগিয়ে চলি, ঋষিকণ্ঠে কবে ধ্বনিত হয়েছিল অভয়মন্ত্র 'চরৈবেতি, চরৈবেতি', – এগিয়ে চল, থেমে থেক না। সেই মন্ত্রই যেন শুনি তাদের কণ্ঠে।

রৌদ্রালোকিত পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এখন আবার আকাশ কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে।

পথে আবার নামলাম শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরে। সামান্য পূজা নিবেদন করে চললাম আমাদের তীর্থপথে। কিছুক্ষণ পরে চারবাসা ভৈরবের ছোট মন্দিরের সামনে এসে আবার আমরা নামলাম। এখানে দেবীকে বস্ত্রদান করা বিধি। পুরোহিতই মূল্য নিয়ে একখণ্ড রেশমী বস্ত্র দিলেন, দক্ষিণাসহ সেই বস্ত্রখণ্ড দেবীকে নিবেদন করলাম আমরা প্রত্যেকেই। এক বিরাট বনস্পতির ছায়া ঘেরা-ছোট একটি চত্বরে একটু বসলাম, চারদিকে অসীম, অগম্য পাহাড়ের শ্রেণী, দূর দিগন্তে ঘন দুর্ভেদ্য অরণ্য, কত বনস্পতি, কত নাম-না-জানা বৃক্ষ-সমাচ্ছাদিত সে অরণ্য, অরণ্যের উপরে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শত শত শৃঙ্গ। এক একটি শৃঙ্গের গায়ে গায়ে, স্তরে স্তরে যেন খোদিত এক-একটি পাষাণের প্রাসাদ। এর মধ্যেই কি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে নির্বাসিত যক্ষের পুরী, কুবেরের অলকা, আর দেবতাদের ধাম? কোথায় নগাধিরাজ হিমালয়ের প্রাসাদ, কোথায় সে মহামহিমাময়ের রাজ-অন্তঃপুর? সে অন্তঃপুরের কোন প্রকোষ্ঠে গিরিরাণী মেনকার কোলে খেলা করেছিলেন আনন্দময়ী উমা? সুকঠিন, সুগম্ভীর গিরিরাজের বক্ষে লীনা কোথায় সে প্রাণ-চঞ্চল বালিকা, বক্ষবিগলিত শতস্নেহ-নির্ঝরিণী ধারায় যাকে অভিষিক্ত করেও গিরিরাজের মন ভরত না, ব্যাকুল হয়ে উঠত আরও কিছু দেবার আশায়? দুইখানি ক্ষুদ্র কোমল রাঙা করতলে বিরাট গিরি-পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করে আধো আধো মধুর কণ্ঠে উমা যখন তাঁকে ডাকত, কলহাস্যে ভরে দিত গৃহ, তখন গিরিরাজের বিশাল বক্ষ কি সুধারসে প্লাবিত হয়ে যেত না, নিবিড় আলিঙ্গনের স্পর্শসুখে, তুচ্ছ হয়ে যেত না কি বিশ্বভুবন?

'চাঁদ ধরে দাও, ও মা, আমায় চাঁদ ধরে এনে দাও'—জননীর অঞ্চল ধরে কেঁদে কেঁদে পদ্মকোরকের মত দুই নয়ন রাঙা হয়ে গেছে, ব্যাকুলা জননী বুকে তুলে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছেন রাঙ্গামুখখানি অঞ্চলে মুছিয়ে দিচ্ছেন চোখ, 'কাঁদে না মা, ও আমার ধন, এই যে এনে দিচ্ছি চাঁদ, আর কেঁদো না,' বলে দর্পণ নিয়ে এসে ধরলেন মুখের সামনে, যাঁর পদনখে শত শত চাঁদ ঝলকিত হয়, তিনি দেখলেন দর্পণে নিজের মুখ। গগনের চাঁদ লুকালেন শৃঙ্গের আড়ালে, উমার মুখশশী আনন্দে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কোথায় সে গিরিরাজ-হর্ম্যের নিভৃত অন্তঃপুর, কোথায় সে প্রাণচঞ্চল শিশু উমার খেলাঘর?

চীরবাসা থেকে আবার যাত্রা শুরু হল আমাদের। ঘোড়া চলেছে দুঃসহ চড়াই অতিক্রম করে, জোরে জোরে পড়ছে তার নিশ্বাস, ফেনা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে, টের পাচ্ছি তার সর্বাঙ্গের কম্পন। মাঝে মাঝে একটু হাঁটছি। কিন্তু খাড়া চড়াই, বচনলাল এপথে নামাতে রাজি নয়, বলে, আমার জন্যে অনর্থক তার দেরি হয়ে যাবে। সঙ্কীর্ণ, পিচ্ছিল পথে চলেছে একের পর এক ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঘোড়া। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক স্ফটিক-স্বচ্ছ শৃঙ্গ, দূরে, বহুদূরের থেকেও বিকীর্ণ হচ্ছে তার জ্যোতির্ময় শুভ্র রূপরশ্মি যেন ঝক্ ঝক্ করছে কাচের দ্যুতির মত, গলানো রূপার মত। চিৎকার করে সামনের, পেছনের সঙ্গীদের ডাকি, 'দেখুন, দেখুন, চেয়ে দেখুন, ওই যে দেখা যাচ্ছে অপরূপ এক শৃঙ্গ। সম্ভবতঃ অভ্রের পাহাড়, ওই কি কৈলাস-শিখরের কোনও একটি অংশ? বচনলাল বলল, 'সুমেরু শৃঙ্গ', কেউ বলল 'চৌখাম্বা', কেউ আবার বলল 'কৈলাস'।

জানি না কি নাম, কোথায় ধাম এই শৃঙ্গের; কিন্তু কি দেখলাম, কি দেখছি? অপলক চোখে তাকিয়ে আছি, আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এর রূপে রজতশুভ্র স্বচ্ছ জ্যোতির্লেখা বিকীর্ণ হচ্ছে দিগন্তে। 'পাহাড়ীরা বলে, "এদিকে কাছাকাছি কোথায় গিরিরাজ হিমালয়ের 'হিমনগরী' ও 'হিমপ্রাসাদ' অবস্থিত, সেখানেই পার্বতীর জন্মস্থান।*"

*শ্রীমৎস্বামী অখণ্ডানন্দজী লিখিত, 'তিব্বতের পথে হিমালয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হয়ত বা এই শৃঙ্গের মধ্যেই সে প্রাসাদ, গৌরীর জন্মস্থান। নয়ত দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় কৈলাসেরই অঙ্গ ঐ শিখর। সূর্যকিরণে যেন সহস্র সহস্র হীরক-খণ্ড ঝলসিত হচ্ছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছি, দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে আরও দুই একটি শুভ্র তুষারাবৃত শৃঙ্গ।

পাশে গভীর খাদে বয়ে চলেছেন মন্দাকিনী। আমাদের বামপাশে আকাশ চুম্বী পর্বতমালা, ডানপাশে স্তব্ধ শ্যাম-অরণ্য, আমাদের পথে, পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ফুটে আছে সহস্র সহস্র ফুল। নানা রঙে, নানা বর্ণে বিকশিত কুসুমাস্তীর্ণ পথরেখা ধরে চলেছি আমরা, নিম্নের মর্ত্যভূমি ছেড়ে অনেক, অনেক উর্ধ্বে এক অজানা আনন্দলোকে। নয়নাভিরাম সেই রজত-শৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছি, এই কি অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ এই কি শাশ্বত শিবরূপ? চৈতন্যময় হিমালয়ের এই কি প্রাণ-সত্তা?

মাঝে মাঝে নেমে আসছে খরস্রোতা প্রবাহিনীধারা, পথ সঙ্কীর্ণ সঙ্কটময়, পিচ্ছিল কর্কশ পাথরে ছেয়ে আছে, ভীষণ বেগে গড়িয়ে পড়ছে বড়, ছোট অনেক পাথর, গড়িয়ে যাচ্ছে খাদের দিকে। উঁচু, নিচু অসমান বিরাট বিরাট পাথরে প্রতিহত হয়ে গর্জন করে সবেগে নিচের দিকে নামছে শত সহস্রধারা। থমকে দাড়াই, চলতে ভয় পাই, সামনে পাথরের ফলকে লেখা সতর্ক বাণী, 'সাবধান, মাত্র কিছু দিন আগে এখান থেকে পড়ে মারা গেছে কয়েকটি মেয়ে।' সত্যই ভীষণ এ সঙ্কট, ঘোড়া থেকে নেমে কত কষ্টে, কত সন্তর্পণে যে পার হয়ে এলাম, তিনিই পার করে দিলেন তাঁর অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে। এদিকেই ধস নেমে কেদারের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে। শুনলাম আমাদের আগে একদল যাত্রী এতদূর এসেও কেদারে যেতে পারেন নি, তাঁদের ফিরে যেতে হয়েছিল বুকভরা নৈরাশ্য আর আর্তি নিয়ে।

কি সুকৃতি ছিল আমাদের, কি পুণ্য করেছিলাম আমরা, উত্তীর্ণ হলাম সেই ভীষণ পথ। আর বেশি দেরি নেই, এসেছি প্রায় কেদারনাথের দ্বারপ্রান্তে, একটু পরেই পৌছাব তাঁর চরণতলে।

সকল কলুষ তামসহর, জয় হোক্ তব জয়'—জয় হোক্, তোমার জয়

হোক্ হে দেবাদিদেব, আমার মোহ-মলিনতা ঘুচিয়ে নিয়ে যাও তোমার চরণতলে, এই শুধু প্রার্থনা।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি, মাঝে মাঝে একটু হেঁটেও এসেছি, সামনে আর চড়াই নেই। বিস্তীর্ণ এক সমতল ভূমিতে এসে মিশে গেছে আমাদের পথ। এই কেদারধাম। এখন সামনে মন্দাকিনীর সেতু পার হয়ে যেতে হবে মন্দির-প্রাঙ্গণে। এখান থেকেই মন্দির চূড়া দর্শন হয়, কিন্তু আকাশ ঢেকে আছে মেঘে, চূড়া দর্শন হল না।

বেলা প্রায় বারটায় মন্দাকিনীর সেতু পার হলাম। পার হয়ে এলাম আমাদের শেষ তীর্থধামে। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা, মাঝে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। ছোট ছোট নির্ঝরিণী ছোট ছোট গিরিকন্যার মতই যেন আনন্দচঞ্চল নৃত্যে হাস্যে মুখরিত, ছন্দিত করে চলেছে প্রান্তরখানি। ফুল ফটে আছে ঘাসে ঘাসে, গিরিগাত্রে, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলভারে আনত ছোট ছোট গাছগুলি যেন অঞ্জলি নিবেদন করছে দেবাদিদেবের চরণে।

সমস্ত মনপ্রাণ পুলকে শিহরিত হয়ে উঠছে, অন্তর ভরে উঠছে গানে গানে, 'আমার হৃদয় উজাড় করে যা কিছু আছে সব নিয়ে যাও হে ভিখারী শঙ্কর, আমার প্রাণের আকুতি, আমার সুরের অঞ্জলি তুমি গ্রহণ কর' —

হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা —করো হে আমার লজ্জা হরণ॥
পরশ রতন তোমার চরণ - লইনু শরণ, লইনু শরণ।
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো,
যা-কিছু বিরূপ হোক্ তা ভালো—ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥

—রবীন্দ্রনাথ

এসে পৌঁছালাম ধর্মশালার সামনে। বারান্দায় ব্যাগ লাঠি সব ফেলে রেখে এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে, ঐ যে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়া।

সঙ্গীরা সব কোথায় জানি না, আমি এসেছি অনেক পরে তাই একলাই চলে গেলাম মন্দির-প্রাঙ্গণে।

এ মন্দিরের সামনে প্রশস্ত একটি বাঁধান চত্বর, তার সামনে বিরাট নন্দী (বৃষ)। ছোট মন্দিরের ভিতরে বিরাট শিবলিঙ্গ। দরজা এখনও খোলা, বাইরে থেকেই দর্শন হল। ফুলের গন্ধে, ধূপের সৌরভে সুরভিত মন্দিরে অদ্ভুত বিরাট লিঙ্গ, কালো পাথরের স্বয়ম্ভু শিব। কাশী, তারকেশ্বর কোথাও এরকম লিঙ্গ দেখি নি মন্দিরে, ভিতরের ছাতে সারি সারি বনফুলের মালা সাজান, কী এক পুণ্য পবিত্র পরিবেশ। গর্ভগৃহ অন্ধকার, তবু যেন কী এক অপার্থিব উজ্জ্বল আলোয় মন্দির আলোকিত হয়ে রয়েছে। মহিষ অথবা বৃষের পিঠের মত লিঙ্গের আকৃতি, সম্মুখভাগটি ফুলে, রত্ন-অলঙ্কারে সাজানো, বাকি অংশ অনাবৃত।

প্রবাদ এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অগণিত আত্মীয়-বান্ধব প্রভৃতি হত্যার পরে পাণ্ডবেরা বিজয়ী হলেন। কিন্তু ভ্রাতৃরক্ত-লিপ্ত এ বিজয়ে তাঁরা, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির সুখী হতে পারলেন না। পাপের দ্বারা লব্ধ রাজ্যভোগে তাঁর আর স্পৃহা রইল না। তখন বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হবার আদেশ দিলেন। নারদের কানে সব খবরই আসে আগে, তাড়াতাড়ি চলে গেলেন শিবের কাছে, কাশীতে। বললেন, 'সমস্ত পাপের ভার তোমাকে অর্পণ করবার জন্যে পাণ্ডবেরা আসছেন তোমার কাছে, তুমি পালাও।

যিনি ভীষণ কালকূট বিষ ধারণ করেছিলেন বিনা দ্বিধায়, পাণ্ডবদের বিশাল পাপভার ধারণের ভয়ে তিনি যেন বিচলিত হয়ে উঠলেন; কাশী ছেড়ে গোপনে চলে এলেন হিমালয়ে, সম্ভবতঃ 'গুপ্ত কাশী'তে। কিন্তু পশ্চাতে ধাবিত হলেন ভীম। রক্ষা নেই দেখে ভোলানাথ বৃষরূপ ধারণ করে পালাতে গেলেন পাতাল-পথে। পাতালে তাঁর মাথাটি মাত্র যখন প্রবেশ করল, বাকি অঙ্গ তখনও বাইরে, ছুটে এসে সেই অর্ধ অঙ্গই চেপে ধরলেন ভীম। তাই সেখানেই রয়ে গেলেন অর্ধরূপে, বাকি অর্ধেক (মস্তক) আছেন নেপালে পশুপতিনাথে।

কিংবদন্তী আছে, তারপরে পাণ্ডবেরাই তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলেন এখানে, ইনিই কেদারনাথ।

এখন বাইরে থেকে সামান্য মাত্র দর্শন হল, মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে এখনই। সন্ধ্যায় দর্শন হবে আরতি, শৃঙ্গার।

চলে এলাম। এখানেও থাকবার সুন্দর ব্যবস্থা, পাশাপাশি চটি, ধর্মশালা কয়েকটি আছে। পথে দুই-চারটি চা, পুরীর দোকান, ছবি, বই (ধর্মগ্রন্থ) আরও কিছু কিছু মনোহারী জিনিসও সাজিয়ে রেখেছে দোকানীরা। রূপার ত্রিশূল, বিল্বপত্র প্রভৃতিও আছে, শিবের পায়ে নিবেদন করবার জন্যে অনেকেই কিনে নিচ্ছেন। আমিও একটি ছোট বিল্বপত্র কিনলাম।

আস্তানায় এসে একটু বিশ্রাম করতে করতে, খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে বেলা পড়ে এল। আকাশে ঘন মেঘ, বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝে মাঝে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘন কুয়াশার আস্তরণ, শীতের তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে যেন।

এই কদিনে কাপড়-জামায় গৈরিক রং ধরেছে, বোঝার ভয়ে সঙ্গে বেশি আনতে পারি নি। দুই-একটা সাবান-কাচা না করলেই আর চলছে না। বেলা পড়ে এসেছে, কলতলায় (মন্দাকিনীর জল নলের মধ্যে দিয়ে আনা) বসে কাপড় কাচলাম। মাথায়, গায়েও সামান্য জল দিলাম। জল বরফের চেয়েও যেন ঠাণ্ডা। ঘরে এসে কাপড় মেলে দিয়ে দেখি আর দাঁড়াতে পারছি না। প্রবল কাঁপুনি, ম্যালেরিয়ার চেয়েও ভয়াবহ, সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে এসেছে, দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করছে, চুলের গোড়া, লোমকূপগুলি পর্যন্ত ভীষণ কাঁপছে। বিছানায় কোনও মতে বসে মোজা পায়ে দিয়ে, তিনচারটা গরমজামা, গোটা দুই তিন কম্বল অতি কষ্টে গায়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম, ছড়িদার একটা লেপ ভাড়া করে নিয়ে এল, তাও গায়ে দিলাম, তবু আমার কাঁপুনি কমছে না। বুক ভেঙে যাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। অসহায় দেহমন চিৎকার করে উঠতে চাইছে, কিন্তু কণ্ঠরুদ্ধ। পাশে রয়েছেন এত লোক, আমি কাউকে ডাকতে পারছি না। মনে হচ্ছে এই আমার শেষ শয়ন, এই আমার অন্তিম মুহূর্ত। মনে মনে ঠাকুরকে ডাকবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁকে স্মরণ করছি, কিন্তু তাও পারছি না, এই বুঝি আসছে চরম মুহূর্ত, অসাড় দেহ, চেতনা লোপ পেয়ে যাচ্ছে,

তবু একবার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ডেকে উঠলাম, 'তোমার দরজায় এনে আমাকে নিরাশ কর না প্রভু, তোমাকে দেখতে দাও, তোমাকে একবার স্পর্শ করতে দাও দয়াল।

দুই-তিন ঘণ্টা কেমন করে কাটল বলতে পারব না। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, এখনই আরম্ভ হবে দেবাদিদেবের শৃঙ্গার, আরতি। কিন্তু আমি উঠতে পারব না। আরতি দর্শন হবে না আমার? নিরুপায় অক্ষমের ব্যথার আকুতি হয়তো পৌঁছালো তাঁর চরণে, আস্তে আস্তে ফিরে এলাম যেন মৃত্যুর অন্ধকার রাজ্যের দরজার কাছ থেকে চৈতন্যের সীমানায়। চোখ মেলে চাইলাম, আমি বেঁচে আছি। হে শিবশঙ্কর, তোমার করুণায় আবার আমি প্রাণের স্পর্শ পেলাম। হয়তো মহাকাল টেনে নিচ্ছিলেন তাঁর অভয় শীতল চরণে, কিন্তু মৃত্যুভয়াতুর আমাকে ফিরিয়ে দিলেন দেহে।

মঙ্গুদি বকতে লাগলেন, 'এই ঠাণ্ডায় গেছ কাপড় কাচতে, হবে না এরকম অবস্থা, আবার বুদ্ধি দেখ, ভিজা কাপড়টা এনে মেলে দিয়েছে মাথার উপরে।'

আরতির শঙ্খ বেজে উঠেছে, সঙ্গিনীরা সবাই চলে যাচ্ছেন, আমি কি পারব না উঠতে? বহু কষ্টে উঠে বসলাম, এখনও শরীরটা ভীষণ কাঁপছে, দুলছে সমস্ত পৃথিবী। তবু উঠলাম, উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত গরম জামা, চাদর গায়েই রইল, তার উপরে বর্ষাতিটা। লেডি জাম্বুবানের মত চললাম সুধীরের সঙ্গে ধীরে ধীরে, কেঁপে কেঁপে পড়ে যাচ্ছি, তবু গিয়ে পৌঁছালাম তাঁর মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে।

শত দীপালোকে আলোকিত, শত শত ফুলের মালায় সজ্জিত মন্দিরতলে, রাজবেশে, রত্ন-অলঙ্কারে সমুজ্জ্বল শিবলিঙ্গ, সর্বাঙ্গ নয়, শুধু সমুখভাগটিই সজ্জিত। তবু মনে হচ্ছে ঠিক যেন বসে আছেন চন্দ্রচূড়, পরম সুন্দর উমানাথ। মন্দিরে অত্যন্ত ভীড়, তবে এখানকার ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শত শত দর্শনার্থী; এক একজন করে সকলকেই দর্শন করান হচ্ছে, কিন্তু দুই-তিন মিনিট মাত্র দর্শনের সময়-সীমা। আমার পালা এল, সামনে একটু ক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে কতটুকুই বা দর্শন হল? এ যেন ঝাঁকি-দর্শন, চোখ

মেলতে না মেলতেই অদর্শন। তবু কুসুম-সুবাসিত, ধূপগন্ধে সুরভিত মন্দিরে প্রজ্বলিত শত শত প্রদীপশিখার আলোকে ক্ষণমাত্র যাঁর উজ্জ্বল, দীপ্ত রূপ দেখলাম, তিনি সত্য, শিব ও সুন্দর। তিনি শুদ্ধ, জ্ঞানঘন তনু, তিনি অনন্ত, অদ্বৈতের প্রতীক।

দেখা পেলাম, কিন্তু চোখের ক্ষুধা মিটল না, আমার পালা ফুরিয়ে গেল, চলে এলাম বাইরে। তবু মন প্রসন্ন হল, ক্ষণমাত্র হোক তবু তো দর্শন পেলাম হোক বাইরের দেখা, তবু তো দেখলাম। মৃত্যুর কবল থেকে আমাকে কাছে নিয়ে এলেন যিনি, তিনিই তো মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল। সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র যাঁর শাসনে নিয়ন্ত্রিত, মৃত্যু যার ভয়ে ধাবিত তিনিই তো সেই পরমব্রহ্মের রুদ্ররূপ, আবার তিনিই শান্ত শিবরূপ।

বুক ভরে গেল আনন্দে, চোখে এল অঝোর-ঝরা কান্না, 'তুমি আমাকে আনলে তোমার দুয়ারে? আমার প্রতিদিনের নিবেদিত জলের অঞ্জলি কি তোমার চরণ ধুতে পেরেছে, আমার নমস্কার কি গ্রহণ করেছ তুমি?

প্রতীক্ষা আর দর্শনের এই সময়টুকু কোথা দিয়ে কেটে গেল, দেহের কষ্ট টের পেলাম না। এখন আবার শুরু হল যন্ত্রণা, কাঁপতে কাঁপতে ভিজতে ভিজতে অতিকষ্টে গিয়ে পড়লাম আস্তানায়, তারপর বিছানায়। আবার কতক্ষণ কাটল, ওষুধ সঙ্গে আছে, খেলামও, তবু যেন কমতে চাইছে না।

কিছুক্ষণ পরে এখানকার পাণ্ডা এসে নাম-ধাম লিখে নিয়ে পূজার ব্যবস্থাদি করে গেলেন। কাল সকালে পূজা, তার পরেই আমাদের তীর্থযাত্রার সমাপ্তি।

বাইরে বৃষ্টি বেড়েই চলেছে। এক অস্বস্তিকর পরিবেশে জড়োসড়ো হয়ে আছেন সবাই। বৃষ্টি না কমলে কি যে হবে কিছুই জানি না।

মন্দিরের অনতিদূরে একটি ছোট মন্দিরে আচার্য শঙ্করের একটি ছোট মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই দুপুরবেলাতেই গিয়ে দেখে এসেছেন সে মন্দির। এখানে না কি শঙ্করের সমাধিক্ষেত্র। তাঁর দেহাবসান কোথায় হয়েছিল সে কথা সঠিক জানি না। তবে তাঁর জীবনী পড়ে জানা যায়, দেহত্যাগের পূর্বে তিনি শিষ্যদের নিয়ে কেদারধামে এসেছিলেন, তারপর কৈলাসধামে গিয়ে মহাসমাধি-যোগে শিবত্ব লাভ করেন।

মাত্র সাত বৎসর বয়সে বেদ-বেদান্ত আর সমস্ত শাস্ত্র তাঁর অধিগত ও কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। এই শিশু-প্রতিভার পাণ্ডিত্য, যুক্তি ও বাগ্মিতার খ্যাতি তখনই সারা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

পিতৃহীন সাত বৎসরের এই শিশু ভোলানাথ, বৃদ্ধা মাতা বিশিষ্টা দেবীর বক্ষের ধন, নয়নের মণি। কিন্তু এতটুকু বালকের এ কী বিস্ময়কর প্রতিভা, কোথায় লাভ করল এই জ্ঞান, মায়ের মন অজানা আতঙ্কে শিহরিত হয়, 'ওকি আমার, ওকে কি বেঁধে রাখতে পারব আমি?'

সত্যই একদিন জ্যোতিষীরা গণনা করে দেখলেন, মাত্র আট বৎসর এই বালকের পরমায়ু। শুনে মা হাহাকার করে উঠলেন, 'হে শিবশঙ্কর, তোমার কাছে কত আরাধনা করে এই পুত্র লাভ করেছিলাম, হতভাগিনীর বুক শূন্য করে তুমি তাকে নিয়ে যাবে? যদি নিয়েই যাবে তবে দিলে কেন প্রভু?'

জ্যোতিষী বললেন, আরও আট বৎসর পরমায়ু লাভ করতে পারে এই বালক, যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে। 'হয় মৃত্যু, নয় সন্ন্যাস'—মায়ের কাছে দুই-ই প্রায় সমান, চোখের জলে, দুঃসহ যন্ত্রণায় কাটল কয়েকদিন।

একদিন নদীতে স্নানের সময়ে চিৎকার করে উঠল বালক শঙ্কর, 'মাগো আমাকে কুমীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আমি মরে যাচ্ছি মা, যদি তুমি অনুমতি দাও, যদি বল সন্ন্যাস নিতে বাধা দেবে না তুমি, তবেই কুমীর আমাকে ছেড়ে দেবে, তা হলেই আমি বাঁচবো।' মায়ের চোখের সামনে পুত্র তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতল তলে, মৃত্যুর করাল গ্রাসে ভীত জননীর কণ্ঠ থেকে বের হল তীব্র আর্তনাদ—'দিলাম, তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি আমি দিলাম।'

জননী নদীতীরে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। কুমীরের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে উঠে এল শঙ্কর। জননীর অশ্রুজল আর তাকে বাঁধল না, আট বৎসরের এক বালক চলে গেল কঠোর বৈরাগ্যের পথে, একটি দীপ্ত অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বে।

দীর্ঘ বন্ধুর পথ পরিক্রমান্তে গিয়ে পৌঁছাল নর্মদার তীরে গুরু গোবিন্দপাদের চরণ-প্রান্তে। গুরু প্রসন্ন চিত্তে এই দীপ্ত দৃপ্ত বালককে গ্রহণ করলেন শিষ্যরূপে।

গুরুর নির্দেশিত কঠোর সাধনার পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছালেন

সমাধির প্রান্তে, নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে রইলেন দীর্ঘদিন। তারপরে উদ্বোধিত হলেন, লাভ করলেন অদ্বৈত জ্ঞান—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'।

তবু একদিন মাকে মনে পড়ল। ধ্যান-সমাহিত সন্ন্যাসীর বক্ষ আলোড়িত হয়ে উঠল কী এক অব্যক্ত ব্যথায়, মুখ ভরে উঠল মাতৃস্তন্য সুধারসে। বুঝতে পারলেন, অন্তিম শয়নে শায়িতা জননী আকুল কণ্ঠে ডাকছেন তাঁর অন্তিমের ডাক, 'বাবা শঙ্কর, বলেছিলি আমার মৃত্যুকালে দেখা দিবি, কোথায় রইলি তুই, আমি যে চলেছি এই পৃথিবী ছেড়ে, একবার দেখা দিবি না বাপ'। হঠাৎ কালাডির এক নিরানন্দ গৃহে পীড়িতা জননীর কানে এল কার ডাক, 'মাগো এসেছি আমি, চেয়ে দেখ, এসেছে তোমার শঙ্কর।'

মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর চোখে জ্বলে উঠল মৃত্যুঞ্জয়ী আলো, শিবস্বরূপ পুত্রের আলিঙ্গন-স্পর্শ-সুখে রোমাঞ্চিত হল রোগজীর্ণ দেহ।

মৃত্যুকে অতিক্রম করে জননী প্রয়াণ করলেন অমৃতলোকে। বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী বাহির হলেন পরিক্রমায়, প্রতিষ্ঠিত করলেন অদ্বৈতবাদ, ব্রহ্মের শক্তিকে করলেন অস্বীকার। অদ্বৈত অনুভূতিতে পূর্ণ শঙ্কর বিশ্বপ্রসবিনী, জগদ্ধাত্রী, মহাশক্তিকে মিথ্যা মায়ারূপে প্রমাণিত করতে লাগলেন অপূর্ব পাণ্ডিত্য আর যুক্তিজালে।

একদিন কাশীধামে এই মহাজ্ঞানী চলেছেন গঙ্গাস্নানে, পথ জুড়ে শায়িত এক শব, পাশে শোকাতুরা যুবতী স্ত্রী। অসহায় নিরুপায় সদ্যোবিধবা স্বামীর সৎকারের জন্যে কেঁদে কেঁদে সাহায্য চাইছেন পথচারীদের কাছে।

সন্ন্যাসী শঙ্কর বললেন 'পথের উপর থেকে শবদেহটি এক পাশে সরিয়ে রাখো মা, আসা-যাওয়ার পথে রেখো না।'

যুবতী বললেন, 'আমার তো ওঁকে সরাবার শক্তি নেই বাবা, তুমি ওঁকেই বলো না।'

শঙ্কর বিস্মিত, একটু বা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'শবদেহের কি সরে যাবার শক্তি আছে? তুমিই একটু কষ্ট করে সরিয়ে নাও'

যুবতী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বাবা, শক্তি না থাকলে কি একটুও সরা যায় না? শব কি এতটুকু নড়তেও পারে না?'

শঙ্কর এবার সামান্য একটু ক্রুদ্ধ হয়েই বলে উঠলেন, 'তুমি কি এ সামান্য কথাটাও জানো না? মৃতের শক্তি থাকে এরকম অসম্ভব কথা শুনেছ কোথায়, বলছোই বা কেমন করে? এ তো শক্তিহীন মৃত শব, ও সরবে কেমন করে?

কোথায় গেল পতিবিয়োগ-বিধুরার বুকভাঙা আর্তি, শাণিত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বিধবা বলে উঠলেন 'অসম্ভব?' অসম্ভব কেন বাবা? আদি-অন্তহীন এই প্রকৃতি যদি শক্তিহীনা, চৈতন্যহীনা হয়েও ক্রিয়াশীলা হতে পারে, তবে এই শবদেহ সামান্য একটু সরতেও পারবে না কেন?'

চমকিত, বিস্মিত শঙ্কর তাকালেন সেই নারীর দিকে, 'কে ইনি? কে ইনি?'—কোথায় নারী, কোথায় সে প্রাণহীন শব? মুহূর্তে চোখের আবরণ দূর হয়ে গেল, চিদ্‌ঘন অখণ্ড জ্যোতিতে ভরে গেল ত্রিভুবন। পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তমের উপলব্ধিতে ভরে উঠল হৃদয়। শঙ্কর অনুভব করলেন ব্রহ্ম শক্তিমান। শক্তিহীন ব্রহ্ম শব, আর শক্তিমান ব্রহ্মই শিব।

একদিন পার্থিব মায়ের অন্তিমের ডাক শুনে শঙ্কর আকাশমার্গে ছুটে গিয়ে দেখা দিয়েছিলেন তাঁকে। বজ্রকঠোর বৈরাগীর পাষাণ বক্ষ থেকেও নেমে এসেছিল শোক নির্ঝরিণী ধারা, রোগশীর্ণা মায়ের বক্ষে লুণ্ঠিত হয়ে ডেকেছিলেন, 'মা, মাগো।'

আজ আকাশমার্গে অন্তর্হিতা বিশ্বজননীর করুণার স্পর্শে সেই জ্ঞানকঠোর হৃদয় থেকেই প্রবাহিত হল এক অনাস্বাদিত পূর্বস্নিগ্ধ ভক্তিনির্ঝরিণী ধারা। নবলব্ধ অনুভূতিতে-পূর্ণ শঙ্কর ভূমিতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, অশ্রুরুদ্ধ দীর্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠলেন, 'মা, মাগো বিশ্বজননী, শিবশক্তি শিবানী। আমি তোমাকে জেনেছি পেয়েছি তোমার করুণা।'

শুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে মিলে গেল অনুরাগে-রাঙা ভক্তি, শঙ্কর দেখলেন রজতশুভ্র গিরিনিভ হরের বুকে ক্রিয়াশীলা হেমাঙ্গিনী গৌরী। অনুভব করলেন ব্রহ্ম আর শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, অবিচ্ছিন্ন।

বেদান্তভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে রচনা করলেন বহু ভক্তিমূলক স্তব, শিবস্তুতি, বিষ্ণুস্তুতি, কৃষ্ণবন্দনা, গঙ্গাস্তব—স্তোত্ররত্নমালায় সজ্জিত করলেন তাঁর ভারতী।

জ্ঞানসমুজ্জ্বল, আনন্দঘনতনু এই কিশোরকে একদিন দেখা দিলেন ব্যাসদেব,

মাথায় রাখলেন তাঁর কল্যাণস্পর্শে। তাঁর আশীর্বাদে আরও ষোল বৎসর পরমায় পেলেন শঙ্কর।

আচার্য শঙ্কর এবার যাত্রা করলেন তীর্থে তীর্থে, পদব্রজে ভ্রমণ করলেন সারা ভারতবর্ষ। বহু লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করলেন, করলেন দুর্গম হিমালয় শিখরে বদরিনারায়ণের প্রতিষ্ঠা। সাধনা, তপস্যা, ভাষ্যরচনা, আশ্রম-মঠ প্রতিষ্ঠা আর স্বমত প্রতিষ্ঠার আয়োজনে, প্রয়োজনে কোথা দিয়ে কেটে গেল আরও ষোল বৎসর, জীবনে এতটুকু অবসর মিলল না, মিলল না বিশ্রাম। এবারে শেষ হয়েছে কাজ, এখন ঘরে ফেরার পালা। জীবনের আকাশে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা। নির্বাণোন্মুখ অস্ত-রবিকে ঘিরে রয়েছেন শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগী শত শত জন। অশ্রুধারায় প্লাবিত হচ্ছে পরম প্রিয়, পরম ইষ্ট গুরুর চরণতল; কণ্ঠে কাতর করুণ প্রার্থনা, 'আমাদের ত্যাগ করো না প্রভু, তুমি দেহত্যাগ করো না।'

ক্লান্ত বিহঙ্গের এবার নীড়ে ফেরার সময় হয়েছে, শেষ হয়েছে পাখা মেলে দিগন্তে উড়ে যাবার খেলা। সংকল্পে স্থির, তবু প্রসন্ন-করুণ নয়নে তাকালেন শিষ্য, ভক্তদের পানে; বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।'

শত অনুরাগী ভক্ত-পরিবৃত শঙ্কর একে একে উত্তীর্ণ হলেন শত শৃঙ্গ-সমাবৃত হিমালয়, এলেন এই শুভ্রসমুজ্জ্বল চিন্ময় কেদার ধামে। আরও কিছুদিন দেহে থেকে শিষ্যদের দিয়ে গেলেন জীবনের শেষ বাণী, শেষ পথ-নির্দেশ আর শেষ সান্ত্বনা।

তারপর একদিন নিঃসঙ্গ রিক্ত সন্ন্যাসী চলে গেলেন স্তব্ধ মৌন কৈলাস-শিখরে। নিঃসীম, নিরন্ধ্র মেঘলোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন রজতশুভ্র কৈলাস-শিখর, যেন ধ্যান সমাহিত শশাঙ্কশেখর, তাঁর অঙ্গে লীন হয়ে আছেন কাঞ্চনবর্ণা গৌরী।

মহাযোগী গিয়ে দাঁড়ালেন সামনে, চিন্ময় যুগল-রূপের মাধুরী দর্শনে হৃদয় ভরে গেল, অশ্রুতে প্লাবিত হল দুই নয়ন। ধ্যানসমাহিত মহাযোগীর সামনেই যুগলরূপ মিলে গেল এক অখণ্ড সত্তায়, অদ্বয় জ্ঞান মিলিত হয়ে গেল আনন্দে; সেই চৈতন্যঘন আনন্দ-রসসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেল শঙ্কররূপী শঙ্করের সত্তা, 'চিদানন্দ রূপং শিবোঽহম্, শিবোঽহম্'।

সেই কৈলাস-শিখরে, সেই কৈবল্যধামে যাব এত কি পুণ্য করেছি? মানসেই রয়ে গেল মানস সরোবরের ছবি, চোখে দেখা হল না, হবেও না কোনও দিন। স্ফটিক-স্বচ্ছ মানস সরোবরের বুকে আর তীরে তীরে ফুটে রয়েছে সহস্র সহস্র ব্রহ্মকমল, রূপে গন্ধে ভরে গেছে আকাশ-বাতাস, অদূরে জ্যোতির্ময় কৈলাস শিখরে সমাসীন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি। নম্র, নতশিরে তাঁর চরণতলে এসে দাঁড়িয়েছেন মৌন গিরিরাজ, বক্ষের নিভৃতে সঞ্চিত মানসের পুণ্য সলিলে অভিষিক্ত করছেন সেই দুইখানি চরণ, সহস্র বিকশিত কমলে অঞ্জলি ভরে নিয়ে করছেন সেই দেবাদিদেবের অর্চনা।

সেই নিভৃত পূজা প্রাঙ্গণে, সেই চিন্ময় শিবধামে প্রবেশ করব, কোথায় সে তপস্যা?

রাত্রি গভীর বাইরে বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম, অজস্রধারায়। স্তব্ধ নিশীথিনীর অতন্দ্র প্রহরগুলি কেটে যাচ্ছে কি এক অজানা অনুভূতিতে। দিনের বেলায় শুনেছিলাম এ পথেই পঞ্চপাণ্ডব গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে, স্বর্গের পথে। কিন্তু সে পথে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট শৃঙ্গ, চিররুদ্ধ হয়ে গেছে কলিহত জীবের যাত্রাপথ। আমরাও অবরুদ্ধ হয়ে আছি ঘরে। অন্ধকারে ঢেকে গেছে তাঁর মন্দির, আমরা তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখতে পেলাম না। পেলাম না তাঁর প্রসাদ।

'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং' হে রুদ্র, একবার তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দেখাও। নিরাশার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে কণ্টকশয্যায় শুয়ে আছি। তন্দ্রায় জাগরণে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। টের পাই নি কখন থেমে গেছে বৃষ্টি—কৃষ্ণপক্ষের শেষরাত্রে চাঁদ উঠেছে আকাশে। হঠাৎ মঞ্জুদি এসে ডাকলেন, 'উঠে এস, দেখে যাও, বরফের পাহাড়গুলি জেগে উঠেছে।'

ছুটে এলাম বাইরে। নির্মেঘ সুনীল আকাশে খচিত শত শত রত্নাবলী, জ্যোৎস্নায় পুলকিত হিমালয়ের শৃঙ্গরাজী, ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন রজতশুভ্র কেদার শৃঙ্গ, পাশাপাশি তেমনই আরও কয়েকটি শৃঙ্গ—সম্ভবতঃ বদরিনাথের নীলকণ্ঠেরও চূড়া দেখা যাচ্ছে অনেক দূর থেকে। যেন কোন স্বপ্নলোকের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তাকিয়ে রইলাম অপলক চোখে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে কখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখলাম, ব্রত-বিহীন, তপস্যাবিহীন আমার পাশেই সারি সারি দাঁড়িয়ে আছেন মর্ত্যের মানব-মানবী, বিস্মিত নিমেষাহত নেত্রে। ভুলে গেছি জগৎ-সংসার, দেহ, পুত্র, বিত্ত, মিথ্যা হয়ে গেছে সব। সত্য শুধু এই পুণ্যলোকে চিন্ময় জ্যোতির্ময় শিবদর্শন।

এই তো ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির অনুভূত শাশ্বত ধ্যানের রূপ—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,
রত্নকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং, পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

রজত-গিরিনিভ চন্দ্রচূড় জ্যোতির্ময় শিব বসে আছেন ধ্যানাসনে, নিমীলিত ত্রিনয়ন, পঞ্চমুখে হরিনাম গান, সে গানে নন্দিত আকাশ-বাতাস-বিশ্বভুবন।—

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা॥
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা॥
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে
পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে।
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা॥

আজ আকাশের দক্ষিণ দুয়ার খুলে গেছে। পুণ্য প্রভাতে নতুন সূর্যোদয়, আমাদের জীবনেও পরম লগ্নের অভ্যুদয়।

আলোকের ঝর্ণাধারায় অভিষিক্ত তুষার-শৃঙ্গগুলি থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে স্ফটিকস্বচ্ছ দ্যুতি—কি অপরূপ মাধুরী, কি অপার্থিব সৌন্দর্য।

শুনেছি একমাত্র শিবধাম কৈলাস পর্বত ছাড়া সমগ্র হিমালয়ে কেদারধামের মত এত নয়নাভিরাম রূপ আর কোথাও নেই।

গৌরী-ক্ষেত্রে গৌরী যাঁর জন্য দীর্ঘ কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তিনিও নিস্তব্ধ কৈলাসশিখরে মগ্ন ছিলেন গভীর তপস্যায়। সতী-বিহীন শিবের জীবনে কোনও আনন্দই ছিল না। শক্তি-বিহীন শিব শবের মতই নিশ্চল সমাধিতে মগ্ন হয়ে ছিলেন।

তারপরে একদিন সহসা কার প্রেমের আলো এসে ছুঁয়ে গেল তাঁর ললাট, কার ক্রন্দনের সকরুণ স্বর এসে দোলা দিয়ে গেল বক্ষে, তিনি চোখ মেলে চাইলেন। কৈলাসশিখর থেকে নেমে এসে দাঁড়ালেন এই কেদারখণ্ডে। দেখলেন, তাঁরই প্রতীক্ষায় বসে আছেন তাঁরই সতী, নতুন নামে, নতুন রূপে।

সতী হারিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষের যজ্ঞালয়ে। প্রজাপতি দক্ষের দুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সতী। ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ তাঁর প্রিয়তমা কন্যা সতীকে সমর্পণ করেছিলেন শিবের হাতে, কিন্তু তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল না, শিব শ্মশানচারী, অনার্যসুলভ তাঁর আচার আচরণ। পরমা সুকুমারী, মনোহারিণী সতীর যোগ্য কি এই শিব?

তবু দক্ষ ভবিতব্যের বিধান অনিচ্ছাতেই মেনে নিয়েছিলেন, বিরক্তি চেপে রেখেছিলেন ছদ্ম আবরণে। কিন্তু সে ছদ্মবেশ বেশি দিন রইল না, দক্ষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল সামান্য এক উপলক্ষে।

একদিন দেবসভায় যখন দক্ষ উপস্থিত হলেন তখন সমস্ত দেবতা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, উঠলেন না শুধু একা আদি শিব। শিবের এই ঔদাসীন্যে আত্মাভিমানী দক্ষের হৃদয় ক্রোধে, অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। যিনি আত্মারাম, সমদর্শী, মহাযোগী, প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পরিমাপ করলেন অহঙ্কার, আর অভিমানের তুলাদণ্ডে। ব্রহ্মার আদেশে কেন তিনি এই 'শিব' নামধারী, অ-শিব অপবিত্র দেবাধমের হাতে তাঁর সাধ্বী কন্যাকে সম্প্রদান করলেন? পরিতাপে দক্ষের হৃদয় দগ্ধ হতে লাগল। তিনি শিব নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন, ভয়ে লজ্জায় মাথা নত করে রইলেন—স্তম্ভিত দেবগণ। মহাযোগীশ্বর মহাদেব কিন্তু নির্বাক, নিশ্চল। নিমীলিত ত্রিনয়নে ক্রোধবহ্নি জ্বলে উঠল না, ললাটের চন্দ্রে দেখা গেল না এতটুকু ম্লানিমা। সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন নীরবে। তবু দক্ষের ক্রোধান্ধ-হৃদয় শান্ত হল না। তিনি আরম্ভ

করলেন এক যজ্ঞ, সে যজ্ঞ শিবহীন। দেব-ঋষি, মুনি-গন্ধর্ব, ত্রিলোকের সকলেরই নিমন্ত্রণ সেই যজ্ঞে, অনিমন্ত্রিত শুধু শিব আর সতী।

আকাশপথে, বিমানে বিমানে চলেছেন দেবাঙ্গনা, ঋষিপত্নী, দক্ষকন্যাগণ। কৈলাসের এক দীনতম গৃহের বাতায়ন-পথে চেয়ে আছেন সতী। বসনে-ভূষণে উজ্জ্বল মণিরত্নাভরণে সজ্জিতা কত শত শত রমণী চলেছেন যজ্ঞে, তাঁদের কলহাস্যে মুখরিত, গুঞ্জরিত হচ্ছে পর্বতশৃঙ্গ। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-সোহাগিনী আয়ুষ্মতীরা চলেছেন সগৌরবে। ম্লান চোখে চেয়ে আছেন ভিখারী শিবের শিবানী। তাঁরই পিতৃগৃহে এত আয়োজন, এত সমারোহ, আর তিনিই রইলেন বঞ্চিত? চোখভরে এল অশ্রু, অন্তর মন্থন-করা বেদনার ভারে কণ্ঠ হল রুদ্ধ। তবু শিবের কাছে জানালেন আকুতি, পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, বিনম্র ব্যাকুলতায়। কিন্তু বাধা দিলেন শিব, শিবহীন যজ্ঞের পরিণাম তিনি জানেন, জানেন সতীর গভীর প্রেমের পরিমাপ। শিবনিন্দা, পতিনিন্দা শ্রবণমাত্র সতীর ত্রিনয়নে জ্বলে উঠবে যে ভীষণ ক্রোধবহ্নি, সে বহ্নি কোথায় চিরকল্যাণী সতীকে টেনে নিয়ে যাবে, কোন সর্বনাশা অতল জ্বালামুখীতে গিয়ে হবে তার নিমজ্জন?

অনুনয়-জড়িত কণ্ঠে শিব বললেন, 'না সতী যেও না, বিনা নিমন্ত্রণে তুমি দক্ষালয়ে যেও না।

সতীর চোখে অশ্রুর প্লাবন, ভগ্নী, আত্মীয়া-বান্ধবী সকলে সম্মিলিত হয়েছেন তারই পিত্রালয়ে, তিনিই শুধু বঞ্চিত হয়ে থাকবেন এই নিরানন্দ গৃহকোণে? কন্যা যাবেন পিতৃগৃহে, সেখানে আবার কিসের বাধা কিসের নিমন্ত্রণ?

সতী পা বাড়ালেন, তিনি যাবেন, শিবের বাধা মানলেন না। আবারও বাধা দিলেন মহেশ্বর, নিষেধ-কঠোর কণ্ঠে, বললেন, 'না তুমি যেও না, তোমাকে আমি যেতে দেব না।'

'তুমি যেতে দেবে না আমাকে এতই তোমার ক্ষমতা?' সতীর পদ্মপলাশলোচন ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। অশ্রু রূপান্তরিত হল তীব্র, তীক্ষ্ণ অট্টহাস্যে। দিগন্ত শিহরিত করে হা-হা রবে হেসে উঠলেন রুদ্রাণী, কঠোর

কঠিন কণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি যেতে দেবে না আমাকে, আমার গতিরোধ করবে তুমি ?'

ভীত, চকিত শিব চেয়ে দেখেন, ভ্রুকুটি-কুটিল ভীষণ করাল মুখে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কালী, উন্মাদিনী, দিগম্বরী, তাঁর আলুলায়িত কালো কেশে ঢেকে গেছে দিগন্ত। কোথায় তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা কুসুম-কোমলা সতী ? ঊর্ধ্বে, অধে, দক্ষিণে বামে—কোথাও সতী নেই, দশ-দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন দশমহাবিদ্যা একই সে মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, কেউ বীভৎস কেউ সুন্দর, কেউ বা কঠিন, কেউ বা কোমল। কাকে বাধা দিতে গিয়েছিলেন শিব ? বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারিণী পরমাশক্তির গতিরোধ করার কি সাধ্য আছে নিষ্ক্রিয় শিবের ?

সতী চলে গেলেন পিত্রালয়ে। দেখলেন যজ্ঞস্থলী ঘিরে বসে আছেন হোতা, ঋত্বিক্, দেব-ঋষি-মুনি গন্ধর্ব, ত্রিভুবনের সবাই, নেই শুধু শিব আর সতী। দুঃখে অপমানে চোখে এল অশ্রু। নির্মম দক্ষের অন্তঃপুরের নিভৃত অপরিসীম ব্যথায় বিদীর্ণ হচ্ছিল আরও একটি হৃদয়, কাঁদছিলেন সতীর জননী, 'সবাই এল, এল না শুধু আমার সতী।' খবর পেয়ে ছুটে এলেন জননী, অভিমানিনী কন্যাকে বক্ষে তুলে নিলেন নিবিড় স্নেহের আলিঙ্গনে। মুছে দিতে চাইলেন কন্যার সর্ব তাপ। ছুটে এলেন ভগ্নী আত্মীয়া-বান্ধবী, নিয়ে এলেন বসন-ভূষণ-অলঙ্কার। কিন্তু পিতা দক্ষ একবারও ফিরে তাকালেন না। একবারও ডাকলেন না 'সতী' বলে।

সতী চেয়ে দেখলেন শিবহীন যজ্ঞের আড়ম্বর, শুনলেন ভিখারী শ্মশানচারী শিবের অধিকার নেই যজ্ঞভাগে, শুনলেন শিব-নিন্দা। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তুচ্ছ বসন-ভূষণ-রত্নালঙ্কার—শিবহীন যজ্ঞের দম্ভ আর অহঙ্কার। উদ্দীপ্ত হল ক্রোধবহ্নি, ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল নয়ন। সেই বিরাট যজ্ঞশালায়, সেই মহাসভার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রজ্বলিত, দীপ্ত বহ্নিশিখা ! ভীত, চকিত সভা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই দিকে : এক ভীষণ অমঙ্গল আর সর্বনাশের আশঙ্কায় স্তব্ধ নির্বাক সভাস্থল।

অশ্রুরুদ্ধ, ক্রোধতীক্ষ্ণ কণ্ঠে সতী ডাকলেন—'পিতা', বললেন, 'যাঁর নাম

শ্রবণ মাত্র সমস্ত কলুষ দূরে হয়ে যায়, যিনি সকল ভয়েরও ভয়, যিনি দেবাদিদেব, আত্মারাম, মহাযোগীশ্বর, তাঁকেই আপনি বর্জন করলেন, তাঁকেই করেছেন অবহেলা? যিনি সর্বমঙ্গলের মঙ্গল—তিনি শিব নন, তিনি অশিব? ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর চরণধূলি মাথায় তুলে নেন, যাঁর চরণস্খলিত নির্মাল্য-ধারণে পবিত্র হয়ে যায় নিখিল বিশ্ব, সেই বিশ্বনাথকেই আপনি করলেন অপমান?'

'হায়রে দুর্ভাগিনী সতী, হায়রে তোর অকরুণ নিয়তি, দম্ভস্ফীত, লজ্জাহীন দক্ষেরই তুই কন্যা?' আত্মধিক্কারে জর্জরিতা সতী বললেন, 'দক্ষকন্যা, দক্ষকন্যা—এই ঘৃণিত পরিচয় আর আমি বহন করব না, দক্ষের সৃষ্ট এই অপবিত্র দেহ আর আমি রাখব না, শিব আমার জীবন-সর্বস্ব, আমি তাঁর অর্ধাঙ্গিনী, বক্ষবিহারিণী। দক্ষের উৎপন্ন এই পাপ-দেহ নিয়ে তাঁকে স্পর্শ করেছি এতদিন, করুণাঘন, ক্ষমাসুন্দর মহাদেব দক্ষের অপমান তুচ্ছ করে আমাকে স্থান দিয়েছেন তাঁর উদার বক্ষে। কতদিন, কতবার প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমাকে ডেকেছেন, 'দক্ষনন্দিনী' বলে। লজ্জায় মাথা নত করে রেখেছি আমি, হে গর্বান্ধ পিতা, আপনার কন্যা-পরিচয়ে আমার মন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, তাঁর পরিহাসে, তাঁর কৌতুকে আমি যোগ দিতে পারি নি।

না, আর না, এই অপবিত্র দেহ নিয়ে আর আমি তাঁর চরণ ছুঁতে পারব না।'

শিব-স্পর্শসুখ চিন্তায় শিহরিতা সতীর ক্রোধানল এতক্ষণে রূপান্তরিত হল অশ্রুতে, চিরপতির তিনি চিরন্তনী বধূ, অভেদ, অবিচ্ছিন্ন মনপ্রাণ, জ্ঞান আর প্রেমের মিলিত মূর্তি অর্ধনারীশ্বর।

বিচ্ছেদ? সে তো ক্ষণিক, সে তো মায়া মাত্র। পরম দয়িত, পরম নয়নাভিরাম শিবের চরণে মন লগ্ন করে সতী বসলেন ধ্যানাসনে, ধীরে ধীরে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে নিয়ে এলেন দেহ থেকে দেহাতীত লোকে। মহা সতী দেহত্যাগ করলেন। আকাশে বাতাসে উঠল হাহাকার-ধ্বনি, হিমালয়ের বক্ষ বিদীর্ণ হতে লাগল বেদনায়, কেঁপে কেঁপে উঠল তাঁর শৃঙ্গরাজী, ব্যথাতুরা ধরণীর আর্তক্রন্দনে ক্রন্দিত হল দিক্ দিগন্ত।

নিস্তব্ধ কৈলাসশিখরে কেঁপে উঠলেন উৎকণ্ঠিত শিব। যখন সর্বনাশের বার্তা বয়ে নিয়ে এলেন শিবানুচর নন্দী (মতান্তরে নারদ) তখন উঠে দাঁড়ালেন সতীনাথ। ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল শঙ্খশুভ্র ললাট, ত্রিনয়নে জ্বলে উঠল তীব্র বহ্নিশিখা, বিলম্বিত স্বর্ণ জটাজাল উঠল ফুলে, গর্জন করে উঠল শিরোভূষণ নাগ, অঙ্গের নাগিনী দুলতে লাগল ফণা তুলে তুলে, চরণে বেজে উঠল প্রলয় নৃত্যের ছন্দ। হা-হা রবে অট্টহাস্য করে উঠলেন রুদ্র, ছিঁড়ে ফেললেন জটা। সেই জটা থেকে মুহূর্তে উৎপন্ন হলেন ভীষণ-দর্শন কালপুরুষ, বীরভদ্র। যুক্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার প্রতি কি আদেশ প্রভু।'

বজ্রকণ্ঠে শিব বলিলেন, 'ধ্বংস কর দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কর দক্ষকে।' শিবের আদেশ পালিত হল মুহূর্তে। ধ্বংস হল দক্ষযজ্ঞ, নিহত হলেন প্রজাপতি দক্ষ।

এতক্ষণে অশ্রু এল চোখে, বক্ষ বিদীর্ণ করে বের হল আর্ত রব, 'হা সতি, হা প্রাণাধিকে, কোথায় গেলে তুমি? সতি, তুমি যেও না, ফিরে এস, ওগো তুমি ফিরে এস।' মহাদেব ছুটে গেলেন যজ্ঞস্থলে, দেখলেন ভূমিতলে লুটিয়ে আছেন তাঁর বক্ষোবিহারিণী, তাঁরই অর্ধাঙ্গিনী সতী। পরম স্নেহে পরম সন্তর্পণে বক্ষোচ্যুত স্বর্ণলতিকাকে তুলে নিলেন বক্ষে কেঁদে উঠলেন হা-হা রবে। 'তোমাকে আমি যেতে দেবো না।'

সতীর দেহ স্কন্ধে তুলে নিয়ে উন্মত্ত স্খলিত পদে ছুটে চললেন পাগল ভোলানাথ। দেশ-কালের বাধা উল্লঙ্ঘন করে চলল তাঁর পরিক্রমা। সতি, সতি কণ্ঠে শুধু এই আর্তনাদ। কেটে গেল দীর্ঘ দিন, দীর্ঘকাল, তবু ঘুচল না তাঁর শোক। তাঁর স্খলিত শিথিল চরণ-ক্ষেপে কম্পিতা পৃথিবী, বক্ষ বিদীর্ণকরা দীর্ঘশ্বাসে বাতাস স্তব্ধ, মহাকালের শোকে স্তম্ভিত কাল, সৃষ্টি অচল-প্রায়।

দেবগণ প্রমাদ গণলেন, ব্রহ্মাকে সম্মুখবর্তী করে গেলেন বৈকুণ্ঠে, নারায়ণের কাছে জানালেন সকাতর প্রার্থনা, 'সৃষ্টি রক্ষা কর নারায়ণ, শিবকে ফিরিয়ে আন কৈলাসে, তাঁর স্ব-স্বরূপে।'

চিন্তিত হলেন নারায়ণ, কোন্ মন্ত্রে নির্বাপিত করবেন এই বিরহানল, কিসের আকর্ষণে?

সহসা যেন এক আলোর সন্ধান পেলেন। 'সতীর পুনর্জন্ম হবে হিমালয়ের গৃহে, মেনকার কোলে। নতুন জীবনে, নতুন নামে আসবেন সেই সতী হৈমবতী, মনোহারিণী উমারূপে। শিবপ্রাণা, শিব-সমর্পিতা সেই উমাই তো আবার মিলিতা হবেন শিবের সঙ্গে। সেই উমা-জন্মকে করতে হবে ত্বরান্বিত, শিবের বিরহ-বিদীর্ণ বক্ষে দোলাতে হবে উমার প্রেমহার, তবেই তো শিব আবার স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

নিশিদিন কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে, কেটে গেছে যুগ, যুগান্তর, পাগল ভোলানাথ চলেছেন কত অরণ্য-প্রান্তর, কত গিরি নদী অতিক্রম করে। সতীর অঙ্গস্পর্শ-সুখে বিভোর, সতীময় দেহ, মনপ্রাণ। কখন অলক্ষিতে নারায়ণের সুদর্শন চক্র এসে খণ্ডিত করে দিলেন সতীর দেহ ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বময়, জানতে পারলেন না মহাদেব।

হঠাৎ একদিন যেন আবেশ কেটে গেল, বাহ্য চেতনা ফিরে এল চেয়ে দেখেন তাঁর স্কন্ধে সতীর অঙ্গ নেই। 'কখন, কোথায় কমন করে বিলীন হয়ে গেল সতীর দেহ?' ধ্যানে সমাহিত হয়ে অনুভব করলেন নারায়ণের ইচ্ছা। আত্মসমাহিত মহাযোগী ফিরে এলেন কৈলাসে, বসলেন নিশ্চল ধ্যানাসনে। সতীর জন্য আরম্ভ হল শিবের তপস্যা।

কেটে গেল দীর্ঘ দিন, যুগ, যুগান্তর, সে ধ্যান ভাঙল না। তাঁর সে সুকঠোর তপস্যার জ্যোতিতে দীপ্ত হয়ে উঠল কৈলাস শিখর, নিস্তব্ধ গিরিরাজের অন্তরে বিলীন হয়ে গেল একটি রশ্মিরেখা, একটি শিবজ্যোতি।

তারপরে উমারূপে আবির্ভূতা হলেন সতী। সুখময় শৈশব কেটে গেল পিতৃগৃহে। কিশোরী উমা সেই সুখনীড় ত্যাগ করে এসে বসলেন তপস্যায়; চিরন্তন পতিকে লাভ করতে হবে নতুন নামে, নতুন রূপে। দীর্ঘদিন কেটে গেল, সে কঠোর তপস্যার আসনে শিবের ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন উমারূপিনী সতী।

হয়তো কোনও এক স্তব্ধ নিশীথিনীর বিষণ্ণ প্রহরে উমার বক্ষ-মন্থন-করা বেদনার ভার কণ্ঠে ফুটে উঠল সুরের রূপে, অশ্রু এল চোখে। একাকিনী বিরহিনী উমা এই কেদারের শৃঙ্গে শৃঙ্গে খুঁজে ফিরছিলেন তাঁর দয়িতকে, 'হে

শিবশঙ্কর, হে প্রাণারাম, তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে. ওগো বল আমি কি করি?' শিবরঞ্জনীর সুরে সুরে অসহ্য প্রাণের আকুতি মেলে ধরলেন শিবপ্রাণা শিবানী। ষড়জ ঋষভ আর কোমল গান্ধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে পঞ্চমে গিয়ে মূর্ত হয়ে উঠল সে সুরের বেদনা। তারপর ধৈবত ছুঁয়ে, তারার ষড়্জ ঋষভ পেরিয়ে কোমল গান্ধারে এসে যখন সে মূর্তিমতী বেদনা কেঁদে উঠল আর্তরবে, তখন শিহরিত হয়ে উঠল আকাশ। 'হে শিব, হে দয়িত, হে নয়নাভিরাম এস, একবার এসে দেখা দাও'—সুরের কান্না ফিরে এল মুদারায়, কোমল-গান্ধারের সকরুণ মূর্ছনায় মূর্ছিতা হল ধরণী, আবার যখন সেই সুর উদারার ধৈবত ছুঁয়ে লুটিয়ে পড়ল এসে ষড়জে তখন সে সুরের ক্রন্দনে গভীর রাত্রির অতন্দ্র প্রহরগুলি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। কেদারের শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গায়িত সেই সুর অবশেষে কৈলাসে এসে খুঁজে পেল তার পূর্ণতা, পেল অসীমের দেখা। সেই অসীমেই হল তার নিমজ্জন। যাঁর শিরে বিষ্ণুর করুণা-রূপিণী সুরধুনী বিরাজিতা, তাঁরই চরণে এসে উমার অশ্রু সুরধুনী পেল পরম আশ্রয়, পরম নিবৃত্তি।

উমার হৃদয় ভরে উঠল আনন্দ-বেদনায—সুরের ধারা বেয়ে এলেন সেই মহাসুরকার, ছদ্ম ব্রহ্মচারীর বেশে। যাঁর সুরের সুরধুনী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল, তিনি কে? দীর্ঘ বিরহের ওপার থেকে কি ফিরে এল তাঁর সতী? এই যে ধ্যানাসনে বসে আছেন তপোকৃশা জ্যোতির্ময়ী কুমারী, তাঁর চোখে সতীর ছায়া, কণ্ঠে তেমনি সুর, হৃদয়ে যে তেমনি গভীর প্রেম। সকল ব্যথা, সকল সংশয়ের হল অবসান। এই কেদারেই এল মহামিলনের লগ্ন। তারপরে হয়তো সেই মিলনমধুর সন্ধ্যায় শিবের কণ্ঠেও জাগলো সঙ্গীত, হয়তো গৌরীকে শোনালেন 'গৌরী' রাগিণী।

তাঁর ধ্যানের গৌরী মূর্ত হয়ে উঠলেন 'গৌরী' সুরে। মনোহারিণী সুর গৌরীর বরতনুখানি ময়ূরকণ্ঠী বসনে সাজিয়ে দিল ষড়্জ, কোমল, ঋষভ আর ধৈবতের লাবণ্যে সে সুকুমার মুখখানি ঝলমল করে উঠল। গান্ধার তাঁর বক্ষে দুলিয়ে দিল মধুগন্ধে-ভরা মন্দার-মালিকা। সু-মধ্যমার কটিতটে বিলম্বিত মণি-মেখলা, নিখাদ কণ্ঠে পরিয়ে দিল শুভ্র গজমোতির হার। চরণের ছন্দে

ছন্দে বেজে উঠল পঞ্চমের সুমধুর কিঙ্কিণী। মনোহারিণীর লীলা বিকশিত হয়ে উঠল স্তরে স্তরে. বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে। আপন সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্যে মাধুর্যে শিব নিজেই মুগ্ধ বিহ্বল হয়ে গেলেন। বক্ষ উদ্বেলিত হয়ে উঠল, ব্যাকুল দুই বাহু বাড়িয়ে দিলেন গৌরীর অঙ্গ-স্পর্শ সুখ-কামনায়। তখন সুরের গৌরী বিলীন হয়ে গেলেন উমা গৌরীর অঙ্গে. শিবের নিবিড় আলিঙ্গনে ধরা দিলেন উমা। প্রিয়তমের স্পর্শে শিহরিতা উমা লজ্জানম্র নয়ন দুটি তুলে ধরলেন শিবের পানে। বিরহ-তপ্ত শিবের তৃষিত, ব্যগ্র দুইটি ওষ্ঠাধর এসে মিলিত হল গৌরীর রক্তিম স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে। নিবিড় ঘন আলিঙ্গনে মিলিত দুইটি হিয়ায় জাগল রোমাঞ্চ। সেই রোমাঞ্চের পুলক ছড়িয়ে পড়ল নিখিল ভুবনময়! জ্যোৎস্না পুলকিত আকাশের গায়ে গায়ে ফুটে উঠল লক্ষ লক্ষ তারা, হিমালয়ের বক্ষে জাগল শিহরণ। বিচিত্র বর্ণে-গন্ধে ফুটে উঠল কত ফুল ঘাসে ঘাসে, অরণ্য-প্রান্তরে, কঠিন পাষাণের বক্ষে।

তাইত এত রূপ, এত মাধুরী কেদারের।

আরও একদিন এমনি আত্মহারা হয়ে গান করেছিলেন শঙ্কর. সেদিনের সেই নিভৃত সভায় শ্রোতা ছিলেন নারায়ণ।

সেদিন কি নারায়ণের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন নট-নারায়ণ রাগ? সে রাগের মাধুর্যে, সে সুরের মূর্ছনায় নারায়ণের বক্ষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, অকথিত বেদনা আর অনাস্বাদিত আনন্দের ভারে, অঙ্গ হয়েছিল রোমাঞ্চিত, চোখে এসেছিল করুণার অশ্রু। নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারলেন না, নারায়ণ বিগলিত হয়ে গেলেন।

সেই বিগলিত করুণাই জাহ্নবী, মহাদেব তাঁকে শিরে তুলে নিলেন। সেই করুণাই নেমে এলেন মর্ত্যের তৃষিত-তাপিত সন্তানের কাছে। অলকানন্দা-মন্দাকিনীও সেই করুণারই এক-একটি ধারা।

আজ সেই করুণারূপিণী মন্দাকিনীর জল মাথায় স্পর্শ করে আমরা সবাই পূজার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। এখানে তুষার গলা জলে অবগাহন-স্নান প্রায় অসম্ভব, মন্দাকিনী-বারি স্পর্শ করাই বিধি। শুদ্ধ ক্ষৌম-বস্ত্র পরে, একে একে মন্দিরে এসে দাঁড়ালেন পূজার্থিনীগণ, আমিও এলাম। ঘি, কর্পূরের

বাতি আর সামান্য পূজার উপচারের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিলেন পুরোহিত, সঙ্গে চন্দন, বন্যফুল আর দুই-একটি ব্রহ্ম-কমল (কেদার কমল), তাই নিয়ে সারি সারি বসলাম আমরা, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আবৃত্তি করলাম, ধূপ দীপারতি সারা হল, হল আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদন। তারপর প্রদক্ষিণ। প্রায়ান্ধকার, অপ্রশস্ত গর্ভগৃহে যেন শায়িত বিরাট লিঙ্গরাজ, উপরের চন্দ্রাতপ বিচিত্র বর্ণের কুসুম মালায় সজ্জিত, সমুখে দীপাধারে জ্বলছে দীপশিখা, ভক্তি-নম্র পূজারিণীরা মহাদেবকে ঘিরে ঘিরে করছেন প্রদক্ষিণ, স্তব্ধ গম্ভীর এক পবিত্র পরিবেশ।

সৃষ্টি বিধ্বংসী বিষ ধারণ করে যিনি নীলকণ্ঠ, তিনি তো চরণ মেলেই আছেন, মর্ত্যের ধূলায় মলিন, তাপিত সন্তানদের ডেকে ডেকে বলছেন, 'আয়, আমার কাছে আয়।' তিনি যে সদাশিব আশুতোষ। তিনি স্পর্শাতীত নন। তাঁকে স্পর্শ করা যায়। তাঁর অঙ্গে ঘি মাখাতে হয়, এখানকার এই নিয়ম। ঘি মাখান হল। এবার আলিঙ্গন। দুইহাতে জড়িয়ে ধরলাম সেই বিরাট তুহিনশীতল অঙ্গ। নীলকণ্ঠের অঙ্গে রেখে এলাম কি আরও কিছু গরল? গঙ্গাবারিতে অভিষেক করেছিলাম, এবারে অশ্রু জলের অভিষেক।

সমাপ্ত তীর্থ, সমাপ্ত যাত্রা, অবসান সর্বআকুতির।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং,
গুণহীনমহীশ-গরলাভরণং
রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরং,
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুং ॥

হে শিবশম্ভো, তোমাকে প্রণাম।
'নমঃ শিবায় শান্তায়'—তুমি অদ্বৈত,
তুমি শান্ত—তোমাকে প্রণাম।
শিবশক্তি, জগজ্জননী তোমাকেও প্রণাম।

শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে,
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

বাইরে এলাম। সূর্যের সুবর্ণ-কিরণে ঝলসিত সুনীল আকাশের আসনে বসে আছেন রজত-শুভ্র শিব, অঙ্গ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে স্বচ্ছউজ্জ্বল জ্যোতির্লেখা, অঙ্গে অঙ্গে মিলিতা হয়ে রয়েছেন গলিত কাঞ্চন-বর্ণা গৌরী। স্তব্ধ, মৌন হিমালয় দাঁড়িয়ে আছেন যুক্ত করে, তাঁর চোখে ভক্তি-অশ্রুধারা। মন্দাকিনী চরণ ধুয়ে দিচ্ছেন, বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে অর্ঘ্য সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল প্রান্তর। মহাবিশ্বের মহাকাশে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির চরণতলে যেন সমাসীন দেবগণ তাঁর বন্দনা গান গাইছেন।

কোটি কণ্ঠে বেজে উঠছে 'জয়, জয়' ধ্বনি। 'জয়, জয়' ধ্বনি দিয়ে এই চিন্ময় শিবধাম ত্যাগ করে ফিরে চললাম নিম্নে মর্ত্যভূমির দিকে।

কি দিলাম, আর কি পেলাম কিছুই তো জানি না। চোখ ভরে রইল রূপে, মন ভরে রইল আনন্দে, প্রাণ ভরে রইল বেদনায়।

অনির্বাণ হয়ে থাক এ বেদনা, যেদিন এই বেদনা আরতির প্রদীপ শিখা হয়ে জ্বলে উঠবে, সে দিনই হবে আমার ব্যথার পূজার সমাপন। অসমাপ্ত রইল পূজা, তবু এল যাবার ক্ষণ।—

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই ॥

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই ॥

—রবীন্দ্রনাথ